প্রথম অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর জীবন সংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায়

বুদ্ধদেব বসুর জীবন সংক্ষেপ

আমাদের বাংলা সাহিত্যে যুগে যুগে বিভিন্ন সাহিত্যিক অমূল্য স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বাংলা সাহিত্যের বহু শাখা প্রশাখার মধ্যে দিয়ে তাঁরা উপন্যাস ধারায় এই চিন্তা চেতনার প্রকাশ বিভিন্ন প্রকরণে ঘটিয়ে গিয়েছেন। তাঁদের অনেকে ছিলেন কবি, লেখক ও শিল্পী। প্রত্যেকে স্ব-স্ব সাহিত্য শাখায় যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছেন এবং তাঁদের সৃষ্ট সম্ভার আজ বাংলা সাহিত্যেকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা সাহিত্যে এই নূতন চেতনা ও সাহিত্যে, বিশিষ্টতা অনেকে এনেছিলেন, বুদ্ধদেব বসু তাঁদেরই একজন। তাদের সৃষ্ট সাহিত্য জীবনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। জীবন যে কেবল মহান সাহিত্যে বাঁধা পড়ে তা নয়, জীবন সাহিত্যকেও নূতন চেতনার ভিন্ন স্বাদ আনতে সাহায্য করে। তাই বুদ্ধদেবের জীবন ও সাহিত্য দুই-ই ছিল ঘটনা বহুল। তিনি বাংলা সাহিত্যে এমন কিছু তুলে ধরলেন যা প্রচলিত লেখা থেকে ভিন্ন বলা যেতে পারে। রোমান্টিকতা শুধু তাঁর সাহিত্যে নয়, তাঁর জীবনেও বার বার এসেছিল। তাঁর জীবনে যৌবনের উন্মাদনা, নরনারীর দেহ কামনার উদ্দাম উচ্ছ্বাসকে অনেকটা বিদ্রোহের মতো দেখায়। এই বিদ্রোহ ভাবনা প্রচলিত সাহিত্য ভাবনা থেকে ভিন্ন পথের দিশারী হলেও পুরাতনকে পুরোপুরি বর্জন করে আসে নি। এই ভাবনার বহিঃপ্রকাশ প্রথমে কাব্য কবিতায় ফুটে ওঠে। ক্রমে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তিনি সমভাবে পদচারণা করেছিলেন। তাই রবীন্দ্র পরবর্তী সাহিত্যে বহুমুখী সাহিত্য প্রতিভা বুদ্ধদেব বসু দেখালেন। তাঁর জীবনের সমস্তকিছুই ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। জীবিতকালে খ্যাতি যেমন ছিল তেমনি অখ্যাতি ও বিতর্ক তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। তিনি কখন দেশের কখনও বিদেশের বিভিন্ন কবিদের নিয়ে সমালোচনার বাদানুবাদ করেছিলেন। সেই বছরই এই সমালোচনা হয়তো স্মরণীয় ছিল বা প্রধান ঘটনা ছিল বলা যেতে পারে। সবসময় সাহিত্য ও ব্যক্তি জীবন দুটি এক সময়ে সকলের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল, যা তাঁর জীবনে গভীর আলোকপাত করেছিল। তাঁর চিন্তা, কর্ম ও জীবনযাপনের সমন্বয়ে এমন একটি আদর্শ গড়ে উঠেছিল, যা নূতন বিষয় ভাবনা বলা যেতে পারে। তাঁর সাহিত্য সাধনা জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়েছিল। এই জীবনকে দেখার ভঙ্গি তাঁর কাছে নিছক কল্পনামাত্র নয়, এটাই তাঁর কাছে সত্যকার জীবন, যা একাশি বছরের জীবনেও তাঁকে দেখি কখনও বিলাসী আবার

কখনও অর্ন্তমুখী। এই সুদীর্ঘকাল তাঁর সাহিত্য জীবনকে অস্থির করে তুলেছিল। আবার তাঁর ব্যক্তি জীবনের অনেক ঘটনা সাহিত্য জীবনে প্রভাব ফেলেছিল।

জীবনকে দেখার ভঙ্গি তাঁর কাছে নিরর্থক তত্ত্বকথায় আবদ্ধ ছিল না। সুতরাং বুদ্ধদেবের সাহিত্য জীবন ও ব্যক্তি জীবনের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ সমন্বয় লক্ষ করি। এই সমন্বয়ের ঘটনাগুলি হল পত্রিকা, গল্প ও উপন্যাস রচনা, কবিতা, তুলনামূলক সাহিত্যের জন্য কর্মত্যাগ ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি সমালোচনা। এছাড়া বুদ্ধদেবের বিদেশ ভ্রমণের ঘটনা তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এখন আমরা বুদ্ধদেবের ব্যক্তি জীবনের পরিচয় দিয়ে সাহিত্য রচনায় প্রবেশ করবো।

বুদ্ধদেব বসু ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লায়, এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৮ই মার্চ ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর পিতার নাম ভূদেবচন্দ্র বসু ও মাতা ছিলেন বিনয়কুমারী বসু। তাঁর পিতার আদি নিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকার বিক্রমপুরের মালখা গ্রামে। বুদ্ধদেবের পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়েরই আদি নিবাস ছিল ঐ গ্রামে। মায়ের স্মৃতি বুদ্ধদেবের কখনও মনে পড়েনি। কারণ জন্মের পরেই বুদ্ধদেব তাঁর মাকে হারিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসু নিজেই জানিয়েছিলেন।

"আমি বিনয়কুমারীর প্রথম ও শেষ সন্তান - আমার জন্মের পর চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই প্রসবোত্তর ধনুষ্টঙ্কার রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুই আমার নামকরণের কারণ"।- ১

বুদ্ধদেব ছিলেন পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তাঁর পিতা, পত্নীকে হারিয়ে বছর খানেকের মধ্যে পরিব্রজ্যা গ্রহণ করলেও দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেছিলেন। প্রথম পক্ষের পুত্রকে অর্থাৎ বুদ্ধদেবকে নিজের কাছে না রাখলেও বুদ্ধদেবের সঙ্গে পিতা-পুত্রে আদৌ যোগাযোগ ছিল না এমন বলা যায় না। পারিবারিক জীবনের এই জটিল পরিস্থিতিতে মাতামহ ও পিতামহের ঘরেই বুদ্ধদেবের প্রতিপালনের স্থান হয়েছিল। তাঁরাই ছিলেন বুদ্ধদেবের কাছে পিতা-মাতার মতো। প্রতি মুহূর্তে তাঁরা মাতৃহারা এই শিশুর কাছেই থাকতেন। জন্মদাত্রী মায়ের স্নেহযত্ন না পেলেও তিনি দাদু ও দিদিমার স্নেহ-মমতার কথা জীবনেও ভুলতে পারেন নি। বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন -

"আমি আমার দাদামশাইকে ডাকতাম "দা" এবং দিদিমাকে "মা" বলে। শুধু যে মুখে বলতাম তা নয় ; তাকে মা ছাড়া অন্য কিছু ভাবিনি কখনও, ভাবতেও পারিনি"। - ২

বুদ্ধদেব দাদামশাই-এর আশ্রয়স্থল নিয়ে জীবনে কখনও বিব্রত বোধ করেন নি। বুদ্ধদেব প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছেন এক নিবিড় স্নেহস্পর্শ। মাতৃহীন শিশুর মনোকষ্ট বুদ্ধদেবের জীবনের ত্রিসীমানায় কখনও ঢুকতে পারে নি। বুদ্ধদেবের সঙ্গে দাদামশায়ের স্নেহের বুনুনটা এতই ঘন যে, প্রায় কোথাও ফাঁক নেই, পিতা পুত্রের সম্পর্কের চেয়ে

অনেকটাই বড় তার আয়তন। কেননা দাদামশাই ছিলেন তাঁর জীবনের প্রথম শিক্ষক, বন্ধু ও খেলার সঙ্গী। চাকুরীর সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকি জীবনটা তাঁর কেটেছিল বুদ্ধদেবকে নিয়ে। অল্প বয়সে বুদ্ধদেব স্কুলে ভর্তি না হলেও বাড়ীতে বসে তিনি যে ইংরাজী শিখেছিলেন তার তুলনা হয় না। জীবনের ১০ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধদেব তোৎলামোর সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। অস্পষ্ট বাক্যে দাদামশায়ের সঙ্গে কথোপকথনের একটা ঘটনা এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা হল, যার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেবের মেধার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

একদিন শীতের সকালে বেড়াতে গিয়ে দাদামশাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন -

"Do you see, what I see ?" বুদ্ধদেব উত্তরে জানিয়েছিলেন "A Tree, A Dog, A bullock cart" - ৩

এটা অবশ্যই সম্ভব হয়েছিল তাঁর গভীর ইংরাজী চর্চার ফলে। এছাড়া, এই শৈশব জীবনেই তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই ও ছিন্নপত্র পড়ে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।

বুদ্ধদেবের শৈশবকালে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অশান্তিতে ভরা। এই আবহাওয়া বুদ্ধদেবের মনে তেমনভাবে দাগ না কাটলেও, সেই হিংসাময় পরিবেশ থেকে তিনি কিভাবে বড় হয়ে উঠলেন তার উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। তাঁর জন্মের সাড়ে তিন মাস আগে বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল (১৯০৮ খ্রীঃ)। যে শহরে তাঁর শৈশব জীবন কেটেছিল সেই ঢাকা শহর ছিল তখনকার বিপ্লবীদের মূল আড্ডাস্থল। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯ খ্রীঃ) সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র এগারো বছর। সমগ্র ভারতবর্ষে ঐ ঘটনার এক তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ, চরকা কাটা, খদ্দর পরা ইত্যাদি ঘটনা ধারার মধ্য দিয়ে স্বদেশীরা সে সময় বন্দেমাতরম ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করেছিল। এই শৈশবেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮ খ্রীঃ) ঘটনা বুদ্ধদেবের কিছুটা মনে ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনা বলতে শেষের দিকের দেড় বছরের ঘটনার কথাই তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন বলে আমরা মনে করি। কারণ এই সময় বুদ্ধদেবের বয়স ছিল পাঁচ বছর আট মাস। এই যুদ্ধ তাঁর মনে কোন গভীর ও সুদূর প্রসারী রেখাপাত না

করলেও লেখাপড়ার সামগ্রীর মধ্যে তার প্রভাব পড়েছিল। তিনি সে সম্পর্কে জানিয়েছেন-

"মাঝে কিছুদিন আমাকে কাঠ পেন্সিলের বদলে কাগজের পেনসিল ব্যবহার করতে হয়েছিল, আর সাদার বদলে বালি-কাগজ। আর দিদিমা মাঝে-মাঝে উদ্বিগ্ন হতেন পাছে এবার হয়তো বালামের বদলে রেঙ্গুণি চাল খেতে হয় - এইটুকু ছাড়া আর কোন ফলাফল আমার মনে পড়ে না"।- ৪

এরপর এল সাম্যবাদের যুগ। তখন বুদ্ধদেবের বয়স নয় বছর (১৯১৭ খ্রীঃ) তাঁর এই বয়সে অর্থাৎ ১৯১৭ খ্রীঃ তখন রাশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়েছিল। এরপর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বিশেষ অধিবেশনে গান্ধীজির অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। তারপর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তাসখন্দে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হয়, তখন বুদ্ধদেবের বয়স ছিল বারো বছর। ঐ বছরেই ভারতে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন করা হয়। এই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উচ্ছ্বাস কিছুটা চাপা পড়ে গেছে। শুরু হয়েছে গান্ধীজির নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের সাফল্য ও কৃষক আন্দোলন। এই রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠলেন এই পিতৃ-মাতৃহীন শিশুটি। এর পর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধদেব তেরো বছর বয়সে তাঁর দাদামশায় ও দিদিমার সঙ্গে কুমিল্লা থেকে নোয়াখালিতে চলে এসেছিলেন। নোয়াখালিতে থাকাকালীন মেঘনার ভাঙ্গনের বিভীষিকাময় স্মৃতি তাঁর আজীবন মনে ছিল।তাঁর লেখা থেকে জানতে পারি-

"নোয়াখালির মেঘনার মতো এমন হতশ্রী নদী পৃথিবীর অন্য কোথাও আমি দেখি নি। রুক্ষ পাড়ি, ঘাট নেই কোথাও, কেউ নামে না স্নান করতে, কোন মেয়ে জল নিতে আসে না। তরণীহীন, রঙ্গিন পালের চিহ্ন নেই, জেলে-ডিঙির সঞ্চারণ নেই- একটিমাত্র খেয়া-নৌকা দেহাতি ব্যাপারিদের নিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় পারাপার করে। শহরের এলাকাটুকু পেরোলেই নদীর ধারে-ধারে ঘন বনজঙ্গল, নয়তো শুধু বালুডাঙ্গা, মাঝে মাঝে চোরাবালিও লুকিয়ে আছে- শীতে-গ্রীষ্মে বিস্তীর্ণ চরের ফাঁকে-ফাঁকে শীর্ণ জলধারা বয়ে যায়। বর্ষায় স্ফীত হয়ে ওঠে নদী। বিশাল অন্য তীর অদৃশ্য; কিন্তু তখনও চোখ খুশি হতে পারে না, বরং আমার ভয় করে সেই কালচে-ব্রাউন বিক্ষুব্ধ জলরাশির দিকে তাকাতে-যার উপর দিয়ে, বর্ষার ক-মাস, একটি নিঃসঙ্গ স্টীমার যাতায়াত করে

হাতিয়া-সন্দ্বীপে, পৃথিবী ত্যক্ত দুই দ্বীপ, যেখান থেকে প্রায়ই ভেসে আসে সর্পদংশনের ভীষণ সব কাহিনী। ভাদ্র আশ্বিন মাসে ঝড়ের সংকেত আসে মাঝে-মাঝে, ঘূর্ণি-হাওয়া এঁকে-বেঁকে পাৎলা বৃষ্টি পড়ে সারাদিন- বারো-শ ছিয়াত্তর বা অন্য কোন দূর-বছরের বন্যার স্মৃতি লোকেদের বুকের মধ্যে দুরু দুরু করে। আর এই সব-কিছুর উপরে আছে ভাঙন, অনিবার্য, অপ্রতিরোধ্য ভাঙন। প্রতি বর্ষায় নদী এগিয়ে আসে শহরের মধ্যে- প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে- বিরাট বুড়ো বটগাছ আর অগুনতি পাখির বাসা নিয়ে মস্ত বড় মাটির চাঁই ধ্বসে পড়ে হঠাৎ, ধোঁয়া ওঠে জলের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত, তার পরই নদী আবার নির্বিকার। আমি একাধিকবার এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলাম- একবার কিছুটা বিপজ্জনকভাবে।শোনা গেল অমুক সাহেবের বাংলোকে নদী ধরে ফেলেছে, তিনি সব জিনিশপত্র সস্তায় বেঁচে দিয়ে চলে যাচ্ছেন- রোববার সকালে দাদামশাই আমাকে নিয়ে হাজির হলেন সেখানে, আমার পড়ার মতো কোন বই যদি বা পাওয়া যায়। আমি যখন একমনে বই দেখছি, ঠিক তখনই প্রচন্ড শব্দে পাশের ঘরটি ধ্বসে পড়লো- একটি ফিরিঙ্গী যুবক জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচালো, বরাত জোরে সে-ঘরে তখন আর কেউ ছিল না, মুহূর্তের মধ্যে সব লোক বেরিয়ে এল রাস্তায়, দাদামশাই কাঁপতে কাঁপতে আমার হাত ধরে বাড়ির পথ ধরলেন, কিন্তু তাঁর আগেই তিনি জুটিয়ে ফেলেছিলেন আমার জন্য এক বাণ্ডিল বাছা বাছা বই"।- ৫

বুদ্ধদেবের শিক্ষার জীবন সম্পর্কে তাঁর নিজের লেখা থেকে যে পরিচয় পাওয়া যায় তা এরকম - নোয়াখালির এই ভাঙ্গনের ব্যথা বেদনা এবং অসুস্থ দাদামশাইকে নিয়ে বুদ্ধদেব ও দিদিমা ঢাকায় চলে আসেন, এই সময় তাঁর বয়স ছিল ১৪ বছর। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বয়সে তিনি ঢাকায় এসে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। বুদ্ধদেবের বয়স বেশি থাকায় দাদামশাই তাঁকে একবারে নবম শ্রেণীতে ভর্তি করেছিলেন। প্রাক্ ম্যাট্রিকের শেষ দুটি ক্লাস তিনি এই স্কুলেই পড়েছিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধদেব নবম শ্রেণীতে ভর্তি হলেও দাদা মশায়ের কাছে তাঁর ইংরাজী ও বাংলার প্রশিক্ষণ অব্যাহত ছিল। স্কুলজীবনের প্রথমেই কবি অজিত দত্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। অজিত দত্ত ছিলেন সেই সময় তাঁর সহপাঠী। তাঁর আরেক সহপাঠী ছিলেন পরবর্তীকালের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত। বুদ্ধদেব সম্পর্কে ভবতোষ দত্ত জানিয়েছেন -

"সহপাঠীরা দেখল একটি নতুন ছেলে এসেছে - বেশি কথা বলে না, টিফিনের সময় নানা ধরণের বই পড়ে। মাষ্টারমশাইরা প্রথম দিকে কিছু বুঝতে পারেন নি। কিন্তু

প্রথম পরীক্ষা দেবার পরেই সবার টনক নড়ল। ইংরেজী আর বাংলার খাতা দেখে মাষ্টারমশাইরা অভিভূত। হেডমাষ্টার খাঁ বাহাদুর তসদ্দক আহমদ ছিলেন তাঁর প্রকৃত গুণগ্রাহী। আর বাংলা সাহিত্যে তাঁর অসামান্য প্রীতি ছিল। ইস্কুলে যে একটি প্রতিভাবান ছেলে এসেছে সেটা প্রায় সবাই স্বীকার করে নিলেন।" - ৬

বুদ্ধদেবের কলেজিয়েট স্কুলের পিছনেই ছিল জগন্নাথ কলেজ। স্কুলে যাতায়াতের সময় তিনি কলেজের ছাত্রদের দেখতেন। তিনি এই কলেজিয়েট স্কুলে পড়াকালীন ১৯২৩ খ্রীঃ "পতাকা" ও "ভগ্নরথ" নামে দুটি হাতে লেখা পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। এই পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে দিয়েই জগন্নাথ কলেজের ছাত্র প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের চেয়ে বুদ্ধদেব চার বছরের ছোট ছিলেন। এই সময় দাদামশায়ের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুর ঘটনা তাঁকে আরেকবার পারিবারিক হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত করেছিল। শৈশবজীবনে মা ও দাদামশায়ের মৃত্যু বুদ্ধদেবের জীবনকে কঠিন বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করিয়ে ছিল। বুদ্ধদেব এই পারিবারিক অশান্তির পরিবেশে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ ঢাকা বোর্ডের ম্যাট্রিক:পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পঞ্চম হয়ে পাশ করেন এবং ঐ বছরেই ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হলেন। এই দুঃসময়ে দিদিমা ও বুদ্ধদেবকে আশ্রয় দেন তাঁর দিদিমার মেজভাই নগেন্দ্রনাথ। জীবনের প্রতি বুদ্ধদেবের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এই সময় থেকেই তৈরী হয়েছিল, সাহিত্য রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি জীবনকে দেখতে চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে সাহিত্য জগতে এক অভিনব শিল্পীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কলেজ জীবনেই তাঁর অনেক রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব "পতাকা " ও "ভগ্নরথ" পত্রিকা সম্পাদনা করে যখন জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন সেই বছরই জগন্নাথ কলেজের "কল্লোল" (১৯২৩ খ্রীঃ) পত্রিকার সম্পাদক দীনেশ রঞ্জন দাসের সঙ্গে বুদ্ধদেবের পরিচয় হয়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধদেব যখন ঢাকার ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পড়েন সে সময় "কল্লোল" পত্রিকায় প্রথম লেখা চতুর্থ রচনা "রজনী হ'লো উতলা " (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়। এই গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে ঝড়ের মতো অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে। বুদ্ধদেবের জীবনে বার বার তাঁকে এই অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথম অভিযোগ করেন বীণাপাণি দেবী (মিসেস এ.সি.রায়) "আত্মশক্তি" পত্রিকায়। তিনি লিখেছিলেন -

"এমন লেখককে আঁতুড়েই নুন খাইয়ে মেরে ফেলা উচিৎ ছিল"। - ৭

আবার আরেক সমালোচক লিখেছিলেন -

"লেখক যদি বিয়ে না করে থাকে তবে যেন অবিলম্বে বিয়ে করে, আর বউ যদি সম্প্রতি বাপের বাড়ি থাকে তবে যেন আনিয়ে নেয় চটপট"। - ৮

এছাড়া ঐ গল্পটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ আক্রমণ করেন সজনীকান্ত দাস। তিনি তাঁর "শনিবারের চিঠি" পত্রিকায় রবী-দ্রনাথকে এই ধরনের রচনার বিরুদ্ধে কিছু বলার জন্য প্রার্থনা করলেন। -

"লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাধা-বাঁধনহারা ভেতরের ভাবও তেমন উচ্ছৃঙ্খল। পৃথিবীতে আমরা স্ত্রী-পুরুষের যে সকল পারিবারিক সম্পর্ককে সম্মান করে থাকি, এই সব লেখাতে সেই সব সম্পর্ক বিরুদ্ধ সম্বন্ধ স্থাপন করে আমাদের ধারণাকে কুসংস্কার-শ্রেণীভুক্ত বলে প্রচার করার একটা চেষ্টা দেখি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় এই মাসের (ফাল্গুন, ১৩১৩) কল্লোলে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর "রজনী হ'লো উতলা " নামক একটি গল্প ও অন্যান্য কয়েকটি লেখার উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন প্রবল পক্ষের তরফ থেকে এর প্রতিবাদ বের হবার একান্ত প্রয়োজন আছে। যিনি আজ পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলার সাহিত্যকে রূপ রসে পুষ্ট করে আসছেন তাঁর কাছেই আবেদন করা ছাড়া আমি অন্য পথ না দেখে আপনাকে আজ বিরক্ত করছি " - ৯

এই চিঠির উত্তরে রবী-দ্রনাথ লিখেছিলেন -

"কল্যাণীয়েষু,

কঠিন আঘাতে একটা আঙ্গুল সম্প্রতি পঙ্গু হওয়াতে লেখা সহজে সরচে না। ফলে বাক্‌সংযম স্বতঃসিদ্ধ।

আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনও যেটুকু দেখি, দেখতে পাই, হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুঁচে গেছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল করো না। কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিক কারণ এ স্থলে গ্রাহ্য না-ও হতে পারে। আলোচনা করতে হলে সাহিত্য ও আর্টের মূলতত্ত্ব নিয়ে পড়তে হবে। এখন মনটা ক্লান্ত, উদভ্রান্ত, পাপগ্রহের বক্রদৃষ্টির প্রভাব - তাই এখন বাগবাত্যার ধুলো দিগ্‌-দিগন্তে

ছড়াবার সখ একটুও নেই। সুসময় যদি আসে তখন আমার যা বলার বলব। ইতি ২৫শে ফাল্গুন ১৩১৩।

শুভাকাঙ্ক্ষী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" - ১০

অশ্লীলতার দ্বিতীয় অভিযোগ দেখা যায় তাঁর "সাড়া" (১৯২৬ খ্রীঃ) উপন্যাস প্রকাশের পর হতে। এই উপন্যাস প্রকাশের পর প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। অশ্লীলতার অভিযোগ তাঁর সাহিত্য জীবন ব্যক্তি জীবনকেও প্রভাবিত করেছিল। এই অভিযোগ তাঁর জীবনে প্রথম নয়। তাঁর আঠারো বছর বয়স থেকে তাঁর জীবনের ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত - অভিযোগ তাঁকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। শেষে এর প্রতিক্রিয়া আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল, এমনকি বুদ্ধদেব বসুকে আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল। শুধু "সাড়া" উপন্যাসই নয়, "রাত ভ'রে বৃষ্টি" (১৯৬৮খ্রীঃ) উপন্যাসের জন্য ও আদালতে নিজ পক্ষ সমর্থন করতে হাজির হতে হয়েছিল। তাছাড়া সমরেশ বসুর "প্রজাপতি" (১৩৭৪ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসের জন্য অশ্লীলতার প্রশ্ন আদালত পর্যন্ত গড়ালে বুদ্ধদেব বসু সমরেশ বসুর পক্ষ সমর্থন করে আদালতে সাক্ষী দেন। সাহিত্যের লেখা সম্পর্কে লেখকের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া যায় না বলে "আনন্দবাজার পত্রিকা" অভিমত প্রকাশ করে। এই বিপর্যস্ত সময়ে শহরের বিভিন্ন পাড়ায় বুদ্ধদেবকে নিয়ে রঙ্গ রসিকতা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু নিজেই জানিয়েছেন -

"বন্ধুরা তর্ক চালায় রাজনীতি নিয়ে, আমি নিঃশব্দে শুনি, অথবা শুনি না; অবন্ধু কেউ গায়ে পড়ে মন্তব্য করে 'কবিতা লেখার চেয়ে লণ্ঠন বানানো ভালো' - যে-কথার সত্যি কোন উত্তর নেই - মাঝে-মাঝে রাস্তায় কোন সাইকেল আরোহী বালক আমাকে কবি ! কবি ! বলে টিটকারি ছুড়ে চলে যায়।" - ১১

বুদ্ধদেব বসু এই ভাবে বিভিন্ন বিতর্ক পর্ব অতিক্রম করে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি এর জন্য মাসে ২০ টাকা বৃত্তি পান। ঐ বছরের জুলাই মাসে তিনি ইংরাজীতে অনার্স সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই জুলাই মাসেই হাতে লেখা "প্রগতি" বুদ্ধদেব ও অজিত দত্ত প্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেন। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন তিনি ছাত্র সংসদ কর্তৃক পরিচালিত সাহিত্য বিভাগের ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদক নির্বাচিত হন। এর

পর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজীতে অনার্স সহ বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও মেডেল লাভ করেন। শুধু বি.এ. নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে ছিলেন। সে আমলে একদিকে বুদ্ধদেব একজন সাহিত্যের কৃতী ছাত্র অন্যদিকে অশ্লীল লেখার সমালোচনায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সে সময়ে সাহিত্যে বেশি নম্বর দেওয়া হত না কিন্তু তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৬০ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন। এটা সেই সময় একটা কৃতিত্বের পরিচয়। এখনকার দৃষ্টিভঙ্গিতে খুব সহজ ব্যাপার মনে হলেও সে সময় ৬০ শতাংশ নম্বর পাওয়া মানেই ১০০ শতাংশ নম্বর পাওয়া। প্রতিভাবান ছাত্র হিসাবে প্রথম থেকেই তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

বুদ্ধদেব এইভাবে শিক্ষা জীবনের সাড়ে-নয় বছর ধারাবাহিক ভাবে ঢাকায় কাটিয়েছিলেন, পরে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কোলকাতায় চলে আসেন। কয়েকটি টিউশন করে অসুস্থ দিদিমাকে নিয়ে বুদ্ধদেব দিন অতিবাহিত করেছিলেন। এর পর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে রানু সোমের (বিবাহের পরের নাম প্রতিভা, পিতা আশুতোষ সোম, মাতা সরযুবালা) সঙ্গে পরিচয় হয়। বুদ্ধদেবের "যেদিন ফুটলো কমল" উপন্যাসে নাট্য রূপটি মঞ্চস্থ করার মধ্যে দিয়ে রানু সোমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বুদ্ধদেব এই পরিচয় সূত্রে রানু সোমের বাড়িতে দুই বেলা আসতে শুরু করেন। প্রাক্ বিবাহে বুদ্ধদেবের এই আসা নিয়ে রানু সোমের বাড়িতে শুরু হয় অশান্তি। বিয়ের আগে বুদ্ধদেব ও রানুর মেলামেশা রানুর মামা ভালোচোখে দেখেন নি। বুদ্ধদেব বসুকে মাতাল অপবাদও শুনতে হয়েছে। রানু সোমের বাড়িতে বুদ্ধদেবের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে বাবা, মা, দাদা, মামা এক গোপন বৈঠক করেছিল। এই বৈঠকে গুরুতর তর্ক বেঁধে যায়। তর্কটা ছিল, বুদ্ধদেবের ঘন ঘন আসা এবং বিয়ের প্রস্তাব করা নিয়ে। রানুর মামা বলেছিলেন -

"আত্মপ্রত্যয় ধুয়ে জল খাক আর আপনারা দেখুন। কী করে এভাবে প্রস্তাবটা করতে পারল ভেবে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আপনারা কি জানেন, ওর মদের খরচ কত? সিগারেটের খরচ কত?" - ১২

যদিও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিভা বসু বুদ্ধদেব বসুকে মদ্যপ বলে জানেন নি। শেষে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাদের বিবাহ সম্পন্ন হল।

বুদ্ধদেবের কাছে জীবন ছিল আর্ট এবং তাকে সাহিত্যে উদ্ভাসিত করাই তাঁর লেখার ভঙ্গি। যার ফলে তাঁর জীবন ও সাহিত্য একচ্ছত্র বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। কখনও তাঁর জীবন সাহিত্যকে আবার কখনও সাহিত্য জীবনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। সাহিত্য ছিল তাঁর কাছে এক জীবনাদর্শ। এই জীবনাদর্শ সাধনাই ছিল তাঁর সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ। জীবনাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার তাগিদে বুদ্ধদেব বসু বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। বিদেশের ঘটনাবলীর গুরুত্বের একটা ক্রমপর্যায় তাঁর মানস পটে অসাধারণ দাগ কেটেছিল। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধদেব বসুর বিদেশ যাত্রার প্রথম সুযোগ তৈরী হয়েছিল, তখন তাঁর বয়স ছিল ২৩ বছর। বিষয়টি ছিল অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ে ভাষা বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া। কিন্তু নানা অসুবিধায় সে যাত্রা ব্যর্থ হয়।

তারপর ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম আমেরিকা গিয়েছিলেন। একটি সংস্থার আর্থিক অনুদানে তাঁর এই যাত্রা হয়েছিল। কাজটি ছিল পিটার্সবার্গের "পেনসিলভেনিয়া কলেজ ফর উইমেন"-এ এক বছর ইংরাজী সাহিত্যে অধ্যাপনা করা। তখন বুদ্ধদেবের সাংসারিক অবস্থা ভালো ছিল না, কারণ "স্টেটসম্যান" পত্রিকার সম্পাদনার কাজ তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেবের বন্ধু তৎকালের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবির এই বিদেশ যাত্রার যোগাযোগের ব্যবস্থা ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। পারিবারিক সাক্ষ্যে আরও জানা যায়, ১৯৫৪ তে আমেরিকা থেকে ফেরার পর প্রথম রেফ্রিজারেটর এবং টেলিফোন এসেছিল তাঁদের বাড়িতে। ব্যক্তিগত অভ্যাসেরও অনেক পরিবর্তনও লক্ষ্য করা গিয়েছিল সেই সময়। আগে তিনি ধুতি পাঞ্জাবী ছাড়া পরতেন না, আমেরিকা যাবার সময় প্রথম তিনি স্যুট পরেন। দেশে ফিরে, বাড়িতে পরার পোশাক পাজামা-পাঞ্জাবী ও বিদ্যাসাগরি চটি থাকলেও, বাইরে যাবার পোশাক সাধারণতঃ প্যান্ট-শার্ট হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি সেই পোশাকেই যেতেন। শীতকালে স্যুট পরতেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় সুসময় ছিল এই সময় তাঁর স্ত্রী প্রতিভা বসুর লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই সাফল্যের ছায়া পড়েছিল তাঁদের জীবন যাত্রায়। প্রতিভা বসুর অনেক কালের শখ মেটাবার জন্য গাড়ি কেনা হল একটি, পুরোনো গাড়ি। এই প্রসঙ্গে আমেরিকায় সদ্য পি.এইচ.ডি. করতে যাওয়া কনিষ্ঠ কন্যা মীনাক্ষী বসু (পরে দত্ত, ডাক নাম রিমি)কে বুদ্ধদেব লিখেছিলেন -

"আসল কথাটাই বলিনি - তোর মা জন্মদিনে আমাকে উপহার দিয়েছেন - গাড়ি। তিনি নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই এই তাল তুলেছিলেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস

212073
02 FEB 2009
LIBRARY

করিনি সম্ভব হবে - তেমন প্রয়োজনও বোধ করি নি গাড়ির, এখনও করিনা। বাহাদুর যার ফার্মে কাজ করেন, সেই ভদ্রলোকের দশ বছরের পুরানো একটা Standard Vanguard কেনা হল সাড়ে তিন হাজার টাকায়। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টাকার জোগাড় ছিল না। কিন্তু বইয়ের প্রকাশকরা এমন লোলুপ যে, আশাতীত ভাবে অর্থেরও সংস্থান হলো। চার দরজার বড় গাড়ি, ছ-জন পর্যন্ত বসা যায় (মিমির মতে দশ জন) চেহারাটা তেমন ঝকঝকে আর কি হবে। আমার মত ছিল না, এ এক রাক্ষুসে খরচের ব্যাপার। আমরা কতটুকু বেরোই সত্যি বলতে ?" - ১৩

বুদ্ধদেব বসুর বিদেশ যাত্রার আরো একটি ঘটনায় দেখা যায়, যা তাঁর ব্যক্তি জীবন ও কর্মজীবনকে সবচেয়ে বেশী নাড়া দিয়েছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক থাকাকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধদেব বিরোধী একটি লবি ছিল। তাঁরা চাইছিলেন বুদ্ধদেবকে হতমান করতে। তাঁরা সম্মিলিতভাবে বুদ্ধদেবের বিদেশ যাত্রার ছুটি মঞ্জুর করাকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কাউন্সিল বুদ্ধদেবের ছুটি নামঞ্জুর করতে বাধ্য হয়। এই ঘটনার পর বুদ্ধদেব বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধদেব আমেরিকায় ইন্ডিয়ানা রাজ্যের ব্লুমিংটন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে, ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসাবে বিদেশ গিয়েছিলেন। তাঁর পড়াবার বিষয় ছিল "পূর্ব-পশ্চিমী সংস্কৃতি বিষয়ক বিচার"। এই উপলক্ষে গ্রীক ও ভারতীয় মহাকাব্যের তুলনা করে তাদের মধ্যেকার চরিত্রগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য গুলির আলোচনা করতে গিয়েই "মহাভারতের কথা" গ্রন্থের পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে।

এ প্রসঙ্গে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে আরেকটি বিদেশ যাত্রার ঘটনা উল্লেখ করা দরকার যার প্রতিক্রিয়া দেশে সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। এই ঝড়ের কারণ ছিল বিদেশে বুদ্ধদেবের রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মন্তব্য। এই ঘটনায় কলকাতায় বুদ্ধদেবকে নিয়ে তুমুল

সমালোচনা দেখা গেল। বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে মন্তব্যটি আরম্ভ করেছিলেন এইভাবে-

"Rabibdranath's works are European literature written in the Bengali language, and they are the first of their kind. This remark made by a Bengali poet of today, is of course an exaggeration, but it is exaggeration of this sort that reveal the truth in a flash and make us cogitate on its implication." - ১৪

এই মন্তব্য বিষয়ে বুদ্ধদেবের বিরুদ্ধে কোলকাতায় বিরাট ঝড় উঠেছিল। ছ-মাস পরে বিদেশ থেকে ফিরে এসে বুদ্ধদেব দেখলেন তাঁর মন্তব্যকে ঘিরে একটি প্রবল সমালোচনা বয়ে চলেছে। সবচেয়ে কৌতুকের বিষয় হল এই যে, সে লেখাটি ষোল মাস আগে রেডিওতে সম্প্রচারিত হয়। সবচেয়ে তীব্র আক্রমণ হয় "যুগান্তর" পত্রিকায় -

"বুদ্ধদেব সম্প্রতি বোদলেয়ার, র‍্যাঁবো প্রভৃতি কবিদের লেখা পড়তে শুরু করেছেন - ভালো কথা, কিন্তু অস্থানে-কুস্থানে এই নবীন উৎসাহের জ্ঞানের প্রয়োগ, বিশেষ করিয়া ফরাসী দেশ বা আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে আমরা মর্মাহত"।- ১৫

যে মন্তব্য ঘিরে এত সমালোচনা তা বুদ্ধদেব বসুর ছিল না বলে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছিলেন। বুদ্ধদেবকে সারাজীবন রবীন্দ্র বিদ্বেষের অভিযোগ তাড়া করে ফিরেছে। ছোট খাটো দু-এক খানা লেখার সমালোচনা ও লেখক বিষয়ে কটূক্তি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেবকে রবীন্দ্র বিদ্বেষের অভিযোগ "শনিবারের চিঠির" সম্পাদক দীর্ঘদিন ধরে করে আসছিলেন। বলা যেতে পারে সেই কল্লোলের যুগ থেকেই। কিন্তু ব্যাপারটা জটিল আকার নিয়েছিল ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে বুদ্ধদেবের ইংরাজী ভাষণে - "The age that had produced Tagore was long over" আর "অমৃতবাজার" পত্রিকায় এই বক্তৃতার জন্য বুদ্ধদেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন "The age of Rabindranath is over" এ কথায় রবীন্দ্রনাথও ভুল বুঝেছিলেন। অপপ্রচারের ফলে রবীন্দ্র বিদ্বেষের অভিযোগ তাঁকে সারা জীবন শুনতে হয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধদেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সম্পর্কের ইতিহাসে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আক্রমণের অভিপ্রায় বুদ্ধদেবের মধ্যে ছিল না। বরং বুদ্ধদেব তাঁর রচনা

রবীন্দ্রনাথকে মন্তব্যের জন্য পাঠাতেন, তাঁর মূল্যবান বক্তব্যকেই লেখক চরম গুরুত্ব দিতেন।

রবীন্দ্র-বুদ্ধ সম্পর্কের বিষয়ে বুদ্ধদেবের সেভাবে কোন বিদ্বেষভাব লক্ষ করা যায় না। তিনি বলেছেন আমাদের সম্পর্ক Complex and vital relationship বলে।তিনি রবীন্দ্রনাথকে মনেপ্রাণে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই দেশে ও বিদেশে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা বক্তৃতা দিয়েছেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে পাঁচটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিষয়ে বলেছিলেন -

"Recently, in Bengal, a magazine which claims to be avant-garde roundly deplored my blind devotion to Tagore. Others, finding me lacking in reverence for the great man, attacked me with exemplary gusto. It did not surprise me that the two charges were contradictory. For many a time before this I have been hauled up as an idolater or an iconoclast, or both at once. To you, possibly, this would be an indication of how peculiar and personal my relationship is with Tagore. That of journeyman and master it certainly is, and of a hungering reader and a poet who is apparently. For I have the awful feeling that if Tagore had not existed, I as I am today would not have existed either" - ১৬

এছাড়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মধুরতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল- বুদ্ধদেব বসুই প্রথম রবীন্দ্রনাথের নামে সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণার আবেদন করেন। তিনি এই আবেদন করেছিলেন "কবিতা" পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে। তিনি রবীন্দ্র মেমোরিয়াল কমিটির কাজকর্মের সমালোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখা বুদ্ধদেবের "কবিতা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথকে তিনি মনের গভীরে স্থান দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব শেষ বারের মতো পৃথিবী ভ্রমণ করেন ১৯৬১ সালে, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ এসেছিল সুদূর জাপান, হনুলুলু, আমেরিকা, য়ুরোপ থেকে। ঐ সালের জানুয়ারীর গোড়ার দিকে বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বসু

দুজনে রেঙ্গুন, হংকং হয়ে জাপান পৌঁছে ছিলেন। সেখানে তিনি দশ দিনে গোটা কয়েক বক্তৃতা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে।সেখান থেকে হনুলুলু হয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। এখানে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন বীট নামক একটি বংশের সঙ্গে। বীটদের অন্যতম প্রধান কবি অ্যালেন গীন্‌সবার্গের সঙ্গেও পরিচিত হলেন।

বিদেশ যাত্রা প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বুদ্ধদেব তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমরা তাঁর অধ্যাপক জীবনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ককে তুলে ধরব। একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, বুদ্ধদেবের জীবনে বড় অংশ অধিকার করেছিল তুলনামূলক সাহিত্যের পঠনপাঠন থেকে শুরু করে পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে তাঁর সঙ্গে ছিলেন অমিয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণবেন্দু দাশগুপ্ত। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত লেখক দিব্যেন্দু পালিত লিখেছিলেন -

"শিক্ষক হিসাবে বুদ্ধদেব যে শুধু স্নেহশীল বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন তা নয়। বরং পড়াশুনার ব্যাপারে মাঝে মাঝে তাঁকে মনে হত অত্যন্ত নির্মম ও কঠোর ; সামান্য অবহেলায় হয়ে পড়তেন অসন্তুষ্ট। মনে আছে তাঁর কাছে প্রথম টিউটোরিয়াল ক্লাসের অভিজ্ঞতা। আমরা জনা চার-পাঁচ যারা তাঁর ক্লাসে এসেছিলাম, প্রত্যেকের খাতাই কলমের আঁচড়ে হয়ে গেছে ছিন্ন-ভিন্ন ; গম্ভীর মুখ লক্ষ্য করেই বুঝলাম, ক্ষুব্ধ হয়েছেন তিনি। তার পরেই মুখ খুললেন। - তোমরা সাহিত্যের ছাত্র অথচ সামান্যতম ভাষা জ্ঞান হয় নি এখনও। এটা খুবই লজ্জার কথা। - বলে হঠাৎ তাকালেন আমার দিকে। - দিব্যেন্দু, তোমাকেও বাদ দিতে চাই না। তুমি ইতিমধ্যে গ্রন্থকার হয়েছ, কিন্তু গদ্য লিখেছ ক্লাস সিক্সের ছাত্রের মতো। তোমার জানা উচিত ব্যাকরণসম্মত হওয়াই ভাষার একমাত্র গুণ নয়" - ১৭

বুদ্ধদেবের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ঃ ছাত্রজীবনে দিব্যেন্দু পালিত একবার জটিল চক্ষু রোগের শিকার হয়েছিলেন।

তিনি প্রায় অন্ধই হয়ে গিয়েছিলেন সেই সময় তাঁর শিক্ষক বুদ্ধদেব বসু তাকে যেভাবে সাহায্য করেছিলেন তা ভুলবার নয়। লোক মুখে এই খবর শুনে বুদ্ধদেব দিব্যেন্দুকে চিঠি লিখে তাঁর চিকিৎসার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন।

এই ভাবে বুদ্ধদেব বসুর জীবনের গণ্ডী শুধু বঙ্গদেশ বা ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, জগৎ সভায় নব নব ইতিহাস সৃষ্টিতে ধাবমান এক পাখি ছিলেন তিনি। পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি থেকে উড়তে শুরু করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত আমেরিকা, জাপান, সিঙ্গাপুর, রাশিয়া পাড়ি দিয়েছিলেন। যাদবপুরের চাকরী থেকে ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও তিনি সারাজীবন ঐ সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার চাপে তিনি যখন হতাশায় দিন অতিবাহিত করছেন তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বন্ধু হুমায়ুন কবির। তিনি তাঁর দিকে সাহায্য ও সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর রচনায় ও "আমার ছেলেবেলা" গ্রন্থে অর্থ ও প্রকাশনার সম্পর্কের বিষয়টি বার বার উল্লেখ করেছেন। কারণ অর্থের জন্যই তাঁর কিছুটা লেখার তাগিদ লক্ষ করা যায়। তাঁর মনে বিভিন্ন আশা ছিল। সেই সব আশার মধ্যে সবচেয়ে বড় আশা ছিল বিদেশ ভ্রমণ, কিন্তু হিংসা, স্বার্থপর প্রতিষ্ঠানের ঈর্ষা তাঁর জীবনে এনে দিয়েছিল অন্নের হাহাকার। অবশ্য বুদ্ধদেবের এই অদৃশ্য ঈর্ষার উপস্থিতি তাঁর জীবনে অহরহ ঘটতে দেখি। বুদ্ধদেব বসুর জীবনই যেন তাঁর এক নির্মম প্রতিবেদন। তাই সব স্বপ্ন, সব আশা তাঁর মানসপটে স্বপ্ন হিসাবেই থেকে গেল। বাস্তবের রাস্তায় তার প্রকাশ হতে অতি সামান্যই দেখতে পাওয়া যায়।

তাঁর এই জীবনপাঠ অনুধাবন করে আমাদের মনে হয়েছে তিনি মানুষ হিসাবে ছিলেন অকুতোভয়, তীক্ষ্ণ মেধাবী, সংবেদনশীল, কল্পনা জগতের নির্জনতা পিয়াসী এক সাহিত্যিক। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান। দেশী

ও বিদেশী সাহিত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের চিন্তা চেতনা ধারণা রীতি তাঁর সৃষ্ট ছোটগল্পে, কাব্যে, উপন্যাসে তুলে ধরেছিলেন। তিনি জীবনকে বিভিন্ন কৌণিক দূরত্বে পরিমাপ করেছিলেন। তিনি এবং তাঁর উপলব্ধি নির্যাসই ছিল সাহিত্যকেন্দ্রিক। তাঁর সৃষ্ট শিল্পের মনন অনির্বাণ জ্যোতি হয়ে ভেসে উঠেছিল সাহিত্যে। সুতরাং তাঁর জীবন খাতার রং সাহিত্যের পাতায় ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধদেবের জীবন আমাদের এই সত্য উপলব্ধিতে সাহায্য করেছিল যে, জীবন মানে কিছু ঘটনার সমষ্টি, জীবন মানে মানুষের সঙ্গে মানুষের বাহ্যিক লেনদেন নয়। জীবন মানে নর-নারীর পারস্পরিক অচেতন দেহজ কামনার আকর্ষণ, দূরাগত এক অন্তহীন দ্বান্দ্বিক স্নেহ, প্রেমালাপের মধ্যে ব্যর্থতা ও হতাশার সমুদ্র পার হওয়া ও প্রতি মুহূর্তে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া। আপোশ নয়, বিদ্রোহ ঘোষণা, মনের বদ্ধ জানালা ভেঙ্গে যেতে চায়, তাই তাঁর আকাঙ্ক্ষা সর্বগ্রাসী, সমাজের অনুশাসন সেখানে তুচ্ছ। তাঁর জীবন থেকে আমরা একটা কথা সহজে বুঝতে পারছি যে, জীবনের পরিণতিতে তাকে বিভিন্ন সাহিত্য লেখার বিভিন্ন বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বুদ্ধদেব সাহিত্যের নানা শাখায় ও সাহিত্য সমালোচনায় এবং কবিতা পত্রিকায় সম্পাদনায়, গল্প-উপন্যাস-নাটকে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইংরাজীতে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করে ইংল্যান্ড, আমেরিকায় খ্যাতি পেয়েছেন। বিশিষ্ট রবীন্দ্র অনুরাগী হয়েও রবীন্দ্র কাব্য আলোচনায় অনেক বিতর্কের সূচনা করেছেন। এই বিতর্কিত খ্যাতনামা কবি ১৯৬৭ সালে "তপস্বী ও তরঙ্গিণী" নাটকে এ্যাকাডেমী পুরস্কার এবং ১৯৭০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক "পদ্মবিভূষণ" উপাধিতে সম্মানিত হলেন। তিনি এই খেতাব গ্রহণ করতে অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নি। আবার এই খেতাব প্রত্যাখ্যানও করেন নি বলে জানা যায়।

বুদ্ধদেবের এই ঘটনা বহুল জীবনের পরিচয় দেবার পর এবার তাঁর সাহিত্য আলোচনায় দেখা যায় বহু বিস্তৃত ছিল তাঁর সাহিত্য প্রতিভা। কাব্য, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ও অনুবাদ গ্রন্থ মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা আজ দুইশত-র কাছাকাছি। তাঁর কাব্যে নূতন চেতনা, উপন্যাসে নূতন বিষয় নির্বাচন, প্রবন্ধ ও পত্রিকা সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের আকাশটি হয়েছিল প্রসারিত। এসবের মধ্যে দিয়ে বুদ্ধদেব আপন স্বাতন্ত্র্যের বলয়টিকে করেছিলেন দীর্ঘ ও উজ্জ্বল।

বুদ্ধদেব আর পাঁচ জন কবির মতো সাহিত্য জীবনের যাত্রা শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়েই। তাঁর শৈশব থেকেই এই কবিতা লেখার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। তিনি "নদী" সম্পর্কিত প্রথম কবিতা রচনা করেছিলেন ইংরাজীতে। তাঁর "ডাক" নামে একটি কবিতা তাঁর বালক বয়সের প্রতিভার নিদর্শন বহন করে। এই সময় বুদ্ধদেবের বয়স ছিল বারো বছর। কবিতাটি হলো –

ডাক

বুদ্ধদেব বসু

ঐ শোনো ডাক
ওরে মূঢ়, বঞ্চিত, নির্বাক
ওরে মূক, ওরে বন্ধ, ওরে সন্দ [?], মলিন, বধির,
একবার জেগে ওঠ চঞ্চল অধীর।
সুপ্তির জড়তা ভেদি ঐ শোনো উদাত্ত সে ধ্বনি,
মায়ের শৃঙ্খল খসি বাজিতেছে ওই রণরণি।
একবার জেগে উঠে শোনো সেই ডাক,
হে চির নির্বাক !
ঐ শোনো মাতৃ বন্দনার,
তরুণ কণ্ঠের বাণী মাতৃমন্ত্র করিছে প্রচার,
জীবন করিয়া পণ ঐ দেখ কত মুক্তি-সেনা,
কারাগারে হাসিমুখে সহিতেছে অসীম লাঞ্ছনা।
শুনিয়া তাদের ডাক রক্ত কি নাচে না ?
সকল হীনতা ছাড়ি মাতিবি না – ওরে শান্তি সেনা !

বহে নাকি উষ্ণ হয়ে বক্ষ মাঝে চঞ্চল রুধির ?

হে চির সুধীর !

একবার হবি না পাগল ? - ১৮

বুদ্ধদেব বসু মূলতঃ কবি। তাঁর কাব্য জীবনের সূচনা হয়েছিল "মর্মবাণী" (১৯২৪ খ্রীঃ) থেকে। বুদ্ধদেবের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "মর্মবাণী" থেকে "শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর" পর্যন্ত (১৯৫৩ খ্রীঃ) এই ২৯ বছরে তাঁর জনপ্রিয় কাব্যগুলি প্রকাশিত হয়ে ছিল। তারপর ১৯৫৩ থেকে ১৯৭৩ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে মোট পাঁচটি কবিতার সংকলন। এই পাঁচটি ছিল দেশি বিদেশী কবিতার অনুবাদ - কালিদাসের অনুবাদ (১৯৫৭ খ্রীঃ), ভিক্টর জিভাগো (১৯৬১ খ্রীঃ), শার্ল বোদলেয়ার ঃ তাঁর কবিতা (১৯৬১ খ্রীঃ), হোল্ডালিপের অনুবাদ (১৯৬৭ খ্রীঃ), রিলকের অনুবাদ (১৯৭০ খ্রীঃ) ইত্যাদি। তবে আমরা বলতে পারি যে, ১৯৪৩ খ্রীঃ থেকে ১৯৫৮ খ্রীঃ,- এই পনেরো বছর বুদ্ধদেব বসুর কবিতা রচনার স্বর্ণযুগ। তার পরও অনেক ভালো কবিতা তিনি নিশ্চয় লিখেছিলেন কিন্তু সেগুলো সময়ের আলোয় দীপ্তি পায় নি। বুদ্ধদেব বসুর কাব্যগ্রন্থগুলি হল- মর্মবাণী (১৯২৫ খ্রীঃ), বন্দীর বন্দনা (১৯৩০ খ্রীঃ), পৃথিবীর পথে (১৯৩৩ খ্রীঃ), শীতের প্রার্থনা ঃ বসন্তের উত্তর (১৯৪৫ খ্রীঃ), নতুন পাতা (১৯৪৩ খ্রীঃ), কঙ্কাবতী (১৯৪৩ খ্রীঃ), দময়ন্তী (১৯৪৪ খ্রীঃ), দ্রোপদীর শাড়ী (১৯৪৮ খ্রীঃ), স্বাগত বিদায় (১৯৭১ খ্রীঃ), যে আঁধার আলোর অধিক (১৯৫৮ খ্রীঃ), মরচে পড়া পেরেকের গান (১৯৬১ খ্রীঃ), একদিন ঃ চিরদিন (১৯৭১)।

বুদ্ধদেবের "মর্মবাণী" কাব্যটি "কল্লোল" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাব্যে কবির বক্তব্যের নূতনত্ব ছিল না। কৈশোরের আড়ষ্টতা ছিল কাব্যের সর্বত্র। বুদ্ধদেব বসু এই কাব্যে রবীন্দ্র ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে খুব দৃঢ়তার সঙ্গে নূতন কাব্য সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগুলি সেকালের তরুণ সমাজের প্রিয় ছিল। অনেকেই তাঁকে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত নূতন পথের কবি বলে ভূষিত করেছিলেন। প্রেম, রোমান্স, সৌন্দর্য, নারী বন্দনা, যৌন চেতনার বিষয়গুলি তাঁর কবিতায় আবেগ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উঠে এসেছে। মাঝে মাঝে তিনি সমাজনীতি ও সংস্কারের শৃঙ্খল ভাঙ্গবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। যা বাংলা কাব্যে পালা বদলের ইঙ্গিত বলা যায়, কিন্তু কবিগুরুর জ্যোতিমণ্ডল থেকে সম্পূর্ণ রূপে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না।

কবি বুদ্ধদেবের গর্ব ও বিদ্রোহ তাঁর কাব্য কবিতার মধ্যেই প্রথম ফুটে উঠেছিল। তাঁর কবিতার প্রেম, রোমান্স, নারী বন্দনার ও যৌন চেতনায় বিদ্রোহের ভাবগুলি কবিতায় বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল। তিনি প্রচলিত আদর্শ ও সমাজ সংস্কারের ধারা উত্তরণের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি "বন্দীর বন্দনা" কাব্যের এই নামে কবিতায় বলেছেন-

"আমি কবি, এ সংগীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত উল্লাসে,
এই গর্ব মোর -
অমি যে রচিবো কাব্য, এ উদ্দেশ্য ছিল না স্রষ্টার,
তবু কাব্য রচিলাম।
এ গর্ব বিদ্রোহ আমার।" - ১৯

এই বিদ্রোহের সুর বুদ্ধদেব পেয়েছিলেন ফরাসী কবি বোদলেয়ারের কাছে। এখানে প্রকৃতি ও স্বাভাবিকের বিকল্প হিসাবে শিল্পের ও কৃত্রিমের জয়ধ্বনি শোনা যায় বোদলেয়ারের কবিতায়। এই ভাবনা ও ধারণাগুলি বুদ্ধদেব আত্মস্থ করেছিলেন। পরবর্তী কালে "মরচে পড়া পেরেকের গান" ও "বন্দীর বন্দনায়" এই জয়গান শোনা যায়। "বন্দীর বন্দনা" কাব্য থেকেই বুদ্ধদেব কাব্য জগতে পায়ের তলায় মাটি পেয়েছিলেন। এই কাব্যটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের অকুণ্ঠ প্রসংশা করেছিলেন। এই কাব্যের কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের কাছে জলভরা ঘন মেঘের মত সূর্যের আলোয় রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত বলে মনে হয়েছিল। এই কাব্যে বন্দীর বন্দনার দুটি অর্থ বুদ্ধদেব বসু করেছিলেন। প্রচলিত অর্থে বন্দীর কাজ হল রাজাকে স্তুতি করা, কিন্তু বুদ্ধদেব তা করেন নি। অপর অর্থ হলো অবরুদ্ধ কয়েদী। বুদ্ধদেব এই কাব্য গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দির বুর্জোয়া মর্যাদাবোধ উড়িয়ে দিয়ে রক্ত মাংসের মানুষের জীবন ও যৌবনের উচ্ছ্বাসকেই তুলে ধরেছেন। কারণ বুদ্ধদেব বসু ছিলেন প্রধানতঃ প্রেমের কবি, এজন্য "বন্দীর বন্দনা" কাব্যগ্রন্থে তার প্রেমের রূপটির নানান বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। তবে কবি এই কাব্যে প্রেমকে অতীন্দ্রিয় ও অমৃত ভাবনার চোখে দেখেছেন। অগ্রজ কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এখানেই তিনি অন্য ভাবাদর্শের পার্থক্য দেখিয়েছিলেন।

বুদ্ধদেব "শীতের প্রর্থনা ঃ বসন্তের উত্তর" কাব্যগ্রন্থে জীবন দর্শন ও গঠন রীতির দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে নূতনত্বের স্বাদ এনেছিলেন। এই কাব্যের দুটি বিখ্যাত কবিতা "মৃত্যুর পর" ও "জন্মের আগে", জীবন দর্শনের দলিল রূপে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন তাঁর যৌবনকালে তিনি যৌবনের বন্দনা করেছেন, আবার যৌবনান্তেও তাঁর বিন্দুমাত্র ভাঁটা দেখি না। কেননা জীবন ও যৌবনের পূজারী ছিলেন বুদ্ধদেব। তিনি এই যৌবনের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর সৃষ্টির রহস্যকে অনুভব করেছিলেন। তিনি রাত্রি, পৃথিবী, শীত, বসন্ত, ঋতুরাজের মধ্যে দিয়ে এই ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

বুদ্ধদেব বসুর "বন্দীর বন্দনা", "কঙ্কাবতী", "নূতন পাতা" কবিতাগুলি তাঁর ১৭ থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যে লেখা। বুদ্ধদেব বসুর আরো একটি কাব্য "কঙ্কাবতী"। সেখানেও প্রেমের বিচিত্র রূপই ফুটে উঠেছে। এই কাব্যে কবিতার সংখ্যা আটত্রিশ। বুদ্ধদেব বসুর কঙ্কাবতী প্রেমের কাব্য, এই কবিতাগুলির মধ্যে তিনি বরং জীবনকে স্বীকার করে নিয়েছেন। বুদ্ধদেব সেই কবি, যিনি এই আস্বাদ পেয়েছেন। সময় ও মৃত্তিকার মধ্যে বাসা বেঁধে কঙ্কাবতী হলো মৃত্তিকা ও সময়োত্তর কাব্য। "শেষের রাত্রি" কবিতার নায়িকা কঙ্কা - এই নামটিতে রয়েছে রূপকথার স্পর্শ এবং কবিতায় দেশজ লোকসাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় যোগ রয়েছে। শুধু দেশজ লোক সাহিত্য নয়, "কঙ্কাবতী" গ্রন্থে বুদ্ধদেব দেশজ চলিত কথ্য ভাষার প্রয়োগ শুরু করলেন এবং কথ্য ভাষার মধ্যে থেকে নিষ্কাশন করে এনেছিলেন সুন্দরতা। এই প্রথম তাঁর আঙ্গিক চেতনায় আধুনিকতা শুরু হল।

বোদলেয়ারের পর আরেক জন ফরাসী কবির সঙ্গে বুদ্ধদেবের লেখার সাদৃশ্য দেখা যায়, তিনি হলেন র‍্যাবোঁ। র‍্যাবোঁর কবিতা শুধু বিদ্রোহের কবিতা, বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় আগাগোড়া আছে শৈল্পিক বিদ্রোহ। তাঁর লেখার মধ্যে নগরচিত্র নির্মাণে এই চিত্র ফুটে ওঠে নি। বুদ্ধদেবের সঙ্গে মারিয়া রিলিকের জীবনের একটি সুন্দরতম সাদৃশ্য লক্ষ করি। বুদ্ধদেবের "নতুন পাতা" কাব্য গ্রন্থের নামকরণের সঙ্গে রিলকের কবিমনের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বুদ্ধদেব বসুর "নতুন পাতা" কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত "চিল্কায়

সকাল" একটি অসামান্য কবিতা। কবির এই কবিতার সঙ্গে সৌন্দর্য ও প্রেমের যুগল সত্ত্বা লক্ষ করা যায়। কবি এখানে প্রেম ও সৌন্দর্যের পূজারী। কবিতাটিতে কবির সমস্ত আবেগ, উত্তাপ, চেতনা, রোমান্স প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাটি শুরু হয়েছে অলঙ্কারহীনতায়, প্রকাশের দিক অত্যন্ত ঋজু এবং কবি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাঁর অন্তরের বিহ্বলতার বর্ণনা দিয়েছেন। এই সংহত অথচ আবেগমিশ্রিত বাক্যাংশ একাধিকবার কবিতায় প্রয়োগ হয়েছে। আবার চিল্কাকে কেন্দ্র করে নিঃসর্গ চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। "দময়ন্তী" বুদ্ধদেব বসুর আরেকটি পুরাণাশ্রিত কাব্য। পুরাণের কাহিনীকে অবলম্বন করে কবি নর-নারীর জৈবিক প্রেমের অনিবার্য কঙ্কালময় পরিণতি দেখিয়েছেন। নল ও দময়ন্তীর পুরাণ কাহিনীকে কবি নূতনভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। এই কবিতায় বুদ্ধদেব বসু দেখিয়েছিলেন নিজের জীবনে যে যৌবন অতীত, সে আবার ফিরে এসেছে তাঁর কাব্যময় জীবনে। কবি মনে করেন দময়ন্তী স্বর্গের দেবতা নলকে অনেক শর্তে বরণীয় করে তুলেছিল। কবির আশা তাঁর কন্যা মর্ত্যের এই দাবী পূরণ করবে। কন্যার মধ্যে কবি প্রত্যক্ষ করলেন চিরন্তন দময়ন্তীকে। এই কাব্যের মূল দুটি ভাব হল বাৎসল্য ও শৃঙ্গার রস। এই কাব্যে কবি আবেগ সঞ্চারী স্বভাবের সঙ্গে গদ্যের মিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছেন। এখানে তিনি "ইলিশ", "ব্যাঙ", "কুকুর", "জোনাকী" প্রভৃতি তুচ্ছ বিষয়কে তুলে ধরেছেন। এছাড়া এই কাব্যে বুদ্ধদেবের তিনটি ধারা লক্ষ করা যায়। (ক) প্রেম, (খ) আধুনিক জীবনের অস্তিত্বগত জটিলতা, (গ) অবহেলিত বিষয়ের সৌন্দর্য সন্ধানের প্রবণতা। প্রথম ধারায় প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা দময়ন্তী, দ্বিতীয় ধারা "ছায়াছন্দ", "হে আফ্রিকা"। তৃতীয় ধারায় "ইলিশ", "ব্যাঙ" ইত্যাদি। কবিতা গুলিতে এই তিনটি ধারা প্রতিফলিত হয়েছে, যা বাংলা সাহিত্যে অতি আধুনিকতার নিদর্শন। এছাড়া "দময়ন্তী" কাব্যে যৌবনের উচ্ছ্বাস ও আবেগ প্রকাশিত হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুর কবি পরিচয়ের পর অন্য যেসব বিষয়ের সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন তা হল প্রবন্ধ শিল্প। তিনি প্রবন্ধের পর যদি আর কিছু নাও লিখতেন তবুও এই প্রবন্ধ সাহিত্যের জন্যই কালজয়ী হয়ে থাকতেন। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ, সংকলিত প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, জীবন স্মৃতিমূলক গ্রন্থ মিলিয়ে ছিল ১৮টি। তবে প্রবন্ধ গ্রন্থ ১১ টির বেশি হবে না। এখন সেই তালিকা নীচে দেওয়া হল ঃ

১) কবি সুকুমার রায়, ২) জেরোম কে জেরোম ও তাঁহার সাহিত্য, ৩) আমার ছেলেবেলা, ৪) অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য, ৫) বুদ্ধদেব বসুর চিঠি অচিন্ত্য কুমারকে, ৬) হঠাৎ আলোর ঝলকানি, ৭) কাব্য গ্রন্থ সমালোচনা (প্রথমা ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র, কুসুমের মাস ঃ অজিত দত্ত, আর্টে রিয়ালিজম ঃ দিলিপ কুমার রায়কে পত্র, কিসের জন্য আর্ট ঃ সুবেশ চক্রবর্ত্তীকে পত্র, প্রগতি সম্পাদককে ধূর্জটিপ্রসাদের পত্র, সিনেমা কেন দেখি না) ৮) ঢাকা হতে বুদ্ধদেব ও অজিত কুমারের সম্পাদনায় প্রকাশিত তৎকালীন "প্রগতি" পত্রিকায় মাসিকী শিরোনামায় প্রকাশিত সাহিত্য, ৯) ব্যঙ্গ সাহিত্য, ১০) অতীতের স্মৃতি, ১১) সাহিত্য চর্চা , ১২) শনিবারের চিঠি - সমালোচনা, ১৩) মহাভারতের কথা, ১৪) রামায়ণ, ১৫) আমার যৌবন, ১৬) রবীন্দ্রনাথের চিঠি, বুদ্ধদেব বসুকে (মোট ৩৬টি চিঠি), ১৭) বুদ্ধদেব বসুর চিঠি, রবীন্দ্রনাথকে (মোট ৩৯ টি চিঠি), ১৮) কথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, ১৯) রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক, ২০) রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমাজ চিন্তা ইত্যাদি।

তিনি প্রবন্ধের বিষয় হিসাবে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের নিপুণ পর্যবেক্ষণকে বেছে নিয়েছিলেন। সুতরাং সাহিত্য সমালোচনায় তাঁর প্রবন্ধ আলোচনার প্রিয় বিষয় ছিল সমাজ, রাজনীতি ও সাংবাদিকতা। তিনি যখনই মতামত দেন, প্রসঙ্গক্রমে চলে আসে সাহিত্য সমালোচনা। প্রধানতঃ বাংলা সাহিত্যই তাঁর প্রবন্ধ আলোচনার বিষয় ছিল। যদিও প্রিয় কবি বোদলেয়ার সম্পর্কে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায়। "এক গ্রীষ্মে দুই কবি" প্রবন্ধে বারিস পাস্টেরনাক সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ লিখে ছিলেন। এছাড়া চার্লস চ্যাপলিন বিষয়ে একটি মনোজ্ঞ রচনাও "স্বদেশ ও সংস্কৃতি" গ্রন্থে দেখতে পাই। সংস্কৃত কবিতা নিয়েও তিনি অনেক আলোচনা করেছেন। মেঘদূতের অনুবাদ কর্মের ভূমিকা হিসাবে তাঁর লেখা রচনা মূল্যবান হয়ে আছে। বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ সাহিত্যের সিংহভাগ অধিকার করে আছে রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের সবকটি সাহিত্য প্রকরণ আলোচনাতেই তিনি সমান উৎসাহ দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের

বুদ্ধদেব "শীতের প্রর্থনা ঃ বসন্তের উত্তর" কাব্যগ্রন্থে জীবন দর্শন ও গঠন রীতির দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যে নূতনত্বের স্বাদ এনেছিলেন। এই কাব্যের দুটি বিখ্যাত কবিতা "মৃত্যুর পর" ও "জন্মের আগে", জীবন দর্শনের দলিল রূপে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন তাঁর যৌবনকালে তিনি যৌবনের বন্দনা করেছেন, আবার যৌবনান্তেও তাঁর বিন্দুমাত্র ভাঁটা দেখি না। কেননা জীবন ও যৌবনের পূজারী ছিলেন বুদ্ধদেব। তিনি এই যৌবনের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর সৃষ্টির রহস্যকে অনুভব করেছিলেন। তিনি রাত্রি, পৃথিবী, শীত, বসন্ত, ঋতুরাজের মধ্যে দিয়ে এই ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

বুদ্ধদেব বসুর "বন্দীর বন্দনা", "কঙ্কাবতী", "নূতন পাতা" কবিতাগুলি তাঁর ১৭ থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যে লেখা। বুদ্ধদেব বসুর আরো একটি কাব্য "কঙ্কাবতী"। সেখানেও প্রেমের বিচিত্র রূপই ফুটে উঠেছে। এই কাব্যে কবিতার সংখ্যা আটত্রিশ। বুদ্ধদেব বসুর কঙ্কাবতী প্রেমের কাব্য, এই কবিতাগুলির মধ্যে তিনি বরং জীবনকে স্বীকার করে নিয়েছেন। বুদ্ধদেব সেই কবি, যিনি এই আস্বাদ পেয়েছেন। সময় ও মৃত্তিকার মধ্যে বাসা বেঁধে কঙ্কাবতী হলো মৃত্তিকা ও সময়োত্তর কাব্য। "শেষের রাত্রি" কবিতার নায়িকা কঙ্কা - এই নামটিতে রয়েছে রূপকথার স্পর্শ এবং কবিতায় দেশজ লোকসাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় যোগ রয়েছে। শুধু দেশজ লোক সাহিত্য নয়, "কঙ্কাবতী" গ্রন্থে বুদ্ধদেব দেশজ চলিত কথ্য ভাষার প্রয়োগ শুরু করলেন এবং কথ্য ভাষার মধ্যে থেকে নিষ্কাশন করে এনেছিলেন সুন্দরতা। এই প্রথম তাঁর আঙ্গিক চেতনায় আধুনিকতা শুরু হল।

বোদলেয়ারের পর আরেক জন ফরাসী কবির সঙ্গে বুদ্ধদেবের লেখার সাদৃশ্য দেখা যায়, তিনি হলেন র‍্যাবোঁ। র‍্যাবোঁর কবিতা শুধু বিদ্রোহের কবিতা, বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় আগাগোড়া আছে শৈল্পিক বিদ্রোহ। তাঁর লেখার মধ্যে নগরচিত্র নির্মাণে এই চিত্র ফুটে ওঠে নি। বুদ্ধদেবের সঙ্গে মারিয়া রিলিকের জীবনের একটি সুন্দরতম সাদৃশ্য লক্ষ করি। বুদ্ধদেবের "নতুন পাতা" কাব্য গ্রন্থের নামকরণের সঙ্গে রিলকের কবিমনের কিছু সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বুদ্ধদেব বসুর "নতুন পাতা" কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত "চিল্কায়

কথাসাহিত্য এবং কবিতা নিয়ে দুইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে। এছাড়াও "কবিতা", "দেশ" প্রভৃতি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, ভাষা, ছন্দ, আন্তর্জাতিকতা ও সমাজতত্ত্ব নিয়েও অন্তত বারোটি রচনা আছে। পরে এগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া যে সব কবি বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ সাহিত্যে আলোচনায় অর্ন্তভূক্ত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন- মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সুকুমার রায়, নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণু দে, সমর সেন। এমনকি আধুনিক কালের সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়েও তাঁর দুইটি স্মরণীয় প্রবন্ধ রয়েছে। একটি বাংলা ভাষায় "আধুনিক কবিতার প্রকৃতি" অন্যটি ইংরাজী ভাষায় "Modern Bengali Poetry" । অন্য যেসব প্রবন্ধ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "সাহিত্যচর্চা" গ্রন্থের রামায়ণ ও শিশু সাহিত্য, An acre of Green Grass modern Bengali prose, Pramath Chaudhury এবং "সঙ্গ নিঃসঙ্গতা" ঃ গ্রন্থের রাজশেখর বসু ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তাঁর সাহিত্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল সাহিত্যের তাত্ত্বিক আলোচনা তাঁকে তেমনভাবে উৎসাহিত করে নি। তাঁর প্রবন্ধ সমালোচনায় আগাগোড়া যে জিনিসটা চোখে পড়ে তা হল সাহিত্য বিচারের সুস্থির মানদন্ড তিনি গ্রহণ করেন নি অথবা যেখানে গ্রহণ করেছেন সেখানে তাকেও পুনর্বার বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করেই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া রোমান্টিকতার সংজ্ঞা বুদ্ধদেবের কাছে অন্যরকম, ক্লাসিক বলতে তিনি বহুজন গ্রাহ্য সমালোচনা মেনে নিতে পারেন নি। প্রবন্ধ জগতে বেশিরভাগ লেখা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথই ছিল তাঁর প্রবন্ধের মূল আকর্ষণ। বুদ্ধদেব বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে শুধু রবীন্দ্র বিরোধিতা নয়, রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে নিজের জগৎ তৈরী করার তাঁর অভিপ্রায় ছিল। প্রয়োজনে তিনি রবীন্দ্র বলয়ের বাইরে গিয়ে সেই জগতে অধিষ্ঠিত হতে চেয়েছিলেন। সেই সময় কল্লোলকালের এই প্রয়াস অনেক প্রাবন্ধিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। তবে বুদ্ধদেব আন্তরিক ও সচেতনভাবে এই কাজটি করেছিলেন। এইজন্য নূতন সাহিত্য আদর্শের তত্ত্বগত ভূমি

কথাসাহিত্য এবং কবিতা নিয়ে দুইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে। এছাড়াও "কবিতা", "দেশ" প্রভৃতি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, ভাষা, ছন্দ, আন্তর্জাতিকতা ও সমাজতত্ত্ব নিয়েও অন্তত বারোটি রচনা আছে। পরে এগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া যে সব কবি বুদ্ধদেবের প্রবন্ধ সাহিত্যে আলোচনায় অর্ন্তভূক্ত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন- মাইকেল মধুসূদন দত্ত, সুকুমার রায়, নজরুল ইসলাম, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণু দে, সমর সেন। এমনকি আধুনিক কালের সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়েও তাঁর দুইটি স্মরণীয় প্রবন্ধ রয়েছে। একটি বাংলা ভাষায় "আধুনিক কবিতার প্রকৃতি" অন্যটি ইংরাজী ভাষায় "Modern Bengali Poetry" । অন্য যেসব প্রবন্ধ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "সাহিত্যচর্চা" গ্রন্থের রামায়ণ ও শিশু সাহিত্য, An acre of Green Grass modern Bengali prose, Pramath Chaudhury এবং "সঙ্গ নিঃসঙ্গতা" ঃ গ্রন্থের রাজশেখর বসু ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তাঁর সাহিত্যে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল সাহিত্যের তাত্ত্বিক আলোচনা তাঁকে তেমনভাবে উৎসাহিত করে নি। তাঁর প্রবন্ধ সমালোচনায় আগাগোড়া যে জিনিসটা চোখে পড়ে তা হল সাহিত্য বিচারের সুস্থির মানদন্ড তিনি গ্রহণ করেন নি অথবা যেখানে গ্রহণ করেছেন সেখানে তাকেও পুনর্বার বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করেই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া রোমান্টিকতার সংজ্ঞা বুদ্ধদেবের কাছে অন্যরকম, ক্লাসিক বলতে তিনি বহুজন গ্রাহ্য সমালোচনা মেনে নিতে পারেন নি। প্রবন্ধ জগতে বেশিরভাগ লেখা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথই ছিল তাঁর প্রবন্ধের মূল আকর্ষণ। বুদ্ধদেব বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে শুধু রবীন্দ্র বিরোধিতা নয়, রবীন্দ্র প্রভাবের বাইরে নিজের জগৎ তৈরী করার তাঁর অভিপ্রায় ছিল। প্রয়োজনে তিনি রবীন্দ্র বলয়ের বাইরে গিয়ে সেই জগতে অধিষ্ঠিত হতে চেয়েছিলেন। সেই সময় কল্লোলকালের এই প্রয়াস অনেক প্রাবন্ধিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। তবে বুদ্ধদেব আন্তরিক ও সচেতনভাবে এই কাজটি করেছিলেন। এইজন্য নূতন সাহিত্য আদর্শের তত্ত্বগত ভূমি

পেয়েছিলেন, যার ফলে তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তা অনেক সমালোচকের দৃষ্টিতে পশ্চিমীভাবের বার্তাবহ রূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা যায়, বুদ্ধদেব ছিলেন কৃতি ছাত্র, পরে বিদ্বান অধ্যাপক, পরিপক্ব পত্রিকা সম্পাদক, বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সুগভীর অন্তরঙ্গতা, অন্য দিকে তিনি ছিলেন সাহিত্যঅন্ত প্রাণ। তাই বুদ্ধদেবকে আমরা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার হিসাবে স্মরণ রাখবো।

বুদ্ধদেব বসু কবিতা, প্রবন্ধ এর পাশাপাশি নাটক রচনাতেও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ষাটের দশকে নাটকের জন্যই তিনি এ্যাকাডেমী পুরস্কার পেয়েছিলেন। প্রথম জীবনে একেবারে নাটক লেখেননি এমন নয়, তবে জীবনের শেষের দিকে নাটক রচনার দিকে অধিক আগ্রহ লক্ষ করা যায়। ১৯২৭ থেকে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চারটি নাটক এবং ১৯৬০ থেকে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাকী নাটকগুলি রচনা করেছিলেন। তবে শেষের দিকের নাটকগুলির অধিকাংশই ছিল কাব্য নাট্য।

তাঁর নাটক ও কাব্যনাট্য গুলি হলো, "একটি মেয়ের জন্য" (১৯২৭ খ্রীঃ) রাবণ (১৯৩১ খ্রীঃ), অনুসূয়া (১৯৩৩ খ্রীঃ), মায়ামালঞ্চ (১৯৩৩ খ্রীঃ), প্রায়শ্চিত্ত (১৯৬৩ খ্রীঃ), ইক্ষাকু সেন্নিণ (১৯৬৬ খ্রীঃ), তপস্বী ও তরঙ্গিণী (১৯৬৬ খ্রীঃ), কোলকাতার ইলেক্ট্রা (১৯৬৭ খ্রীঃ), কাল সন্ধ্যা (১৯৬৭ খ্রীঃ), সত্যসন্ধ (১৯৬৮ খ্রীঃ), অনাম্নী অঙ্গনা (১৯৬৯ খ্রীঃ), প্রথম পার্থ (১৯৭০ খ্রীঃ), পূর্ণমিলন (১৯৭০ খ্রীঃ)।

তাঁর অধিকাংশ নাটকেই পুরাণের প্রভাব রয়েছে। পুরাণ কাহিনী থেকে চরিত্রগুলি এলেও তারা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে কোন স্বর্গীয় রাজ্যে বিরাজ করেন নি। তারা যেন রক্ত মাংসের সাংসারিক মানুষ। তাদেরকে আমাদের সাংসারিক জীবনের প্রতিনিধি বলে মনে হয়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধদেব রচনা করেন "একটি মেয়ের জন্য" নাটকটি। এই নাটক রচনার সময়েই তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেকালে নাটকটি ঢাকার জগন্নাথ কলেজের হলে অভিনীত হয়েছিল। নাটককটির কাহিনীও বড় বেশি করে বানিয়ে তুলে বুদ্ধদেব দর্শকের মনোরঞ্জন করেছিলেন। ফলে নাটকের মধ্যে দিয়ে কোন শিল্পবোধ আমাদের চোখে পড়ে না। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু জানিয়েছেন পুরানা পল্টনে

একটি সদ্য যৌবনা প্রতিবেশিনীকে তিনি ভালোবেসেছিলেন, বিনা বাক্যালাপে শুধু রাস্তার উপরে চোখের দেখাতেই তাকে ভালোবেসেছিলেন। সেই ক্ষণিকের প্রণয়ের বেদনা এই মেয়েটিকে তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুতে তুলে ধরেছিলেন। কন্যার পিতা এই উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতি ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ করেছিলেন। সে সময় বুদ্ধদেব বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বুদ্ধদেবের এই লেখা নাটকটিতে শুধুমাত্র চুম্বনের দৃশ্য বাদ দিয়ে জগন্নাথ হলে অনুমোদন দিয়েছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আরো একটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিলেন। "কালো হাওয়া" উপন্যাসের নাট্যরূপ দিলেন "মায়ামালঞ্চ" নামে। এই নাটকটিতে তিনি নিছকই দর্শকের ও মঞ্চের তাগিদে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। এই ভাবে ১৯৬০ সালের আগে তাঁর নাটকগুলি অধিকাংশই মঞ্চে অভিনয়ের জন্য রচিত হয়েছিল বলা যায়। এই নাটকগুলিতে তেমনভাবে বুদ্ধদেবের নাট্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না।

১৯৬০ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে রচিত নাটকগুলি অধিকাংশ ছিল কাব্যনাট্য। তবে তার কাব্যনাট্যে ভারতীয় পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের ঘটনা ও চরিত্রগুলি নাটকে স্থান পেয়েছিল। ১৯৬৭ সালে রচিত "কালসন্ধ্যা" একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যনাট্য। এই নাটকে বুদ্ধদেব কল্পনার অধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মৌষল পর্ব অবলম্বনে লেখা এই নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্রের ভূমিকায় আছে অথিরিটি। তার সঙ্গে জনতা ও জন নায়কের বিচ্ছেদ ঘটেছে। এই বিচ্ছেদ অবশ্য আদর্শের বিরুদ্ধে। নাটকের শেষে অথিরিটির বিপর্যয় দেখানো হয়েছে। আবার প্রথম পার্থ (১৯৭০ খ্রীঃ) নাটকে কর্ণের ক্ষণস্থায়ী মাতৃমোহ এক মহাজাগরণে ভেঙ্গে যায়। মাতৃ-হৃদয়ের আকুল বেদনা কুন্তীর মধ্যে দেখা দিয়েছে। যা কর্ণকে বার বার হাতছানি দিয়েছিল। তাঁর নাটকের শেষের দিকে কর্ণের আদর্শবাদী চরিত্র বীর ধর্মকে আঁকড়ে থাকতে দেখি। বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী সংবাদে কর্ণ চরিত্র যেভাবে চিত্রণ করেছেন এখানে তার কোন হেরফের দেখি না। আবার "অনাম্নী অঙ্গনা" কাব্য নাট্যে বুদ্ধদেবের কবিত্ব অতিমাত্রায় কাজ করেছে। এখানে কবির নাট্য রস অনেকটা কবিতার ছায়ায় ঢাকা পড়েছে। নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্র অঙ্গনার জীবনের রূপান্তর ঘটেছে একটি মন্ময়ধর্মী অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। নাটকের বন্ধন ছিল শিথিল। স্বগতোক্তির মাধ্যমে বুদ্ধদেব নাট্য কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করেছেন। "সংক্রান্তি" নাটকেও বুদ্ধদেব পুরাণ কাহিনীকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করেছেন। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রে বুদ্ধদেব মূল মহাভারতের ভাবাদর্শ অনেকাংশে গ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর সঙ্গে বুদ্ধদেবের গান্ধারীর মৌলিক

পার্থক্য লক্ষ করা যায়। গান্ধারীর হৃদয় বেদনা ততটা এখানে তীব্র হয়ে ওঠে নি। "কলকাতা ইলেকট্রা" নাটকে ও "পুনর্মিলন" নাটকে বুদ্ধদেব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে রচনা করেছিলেন। ব্যক্তির বিপন্ন বোধ থেকে চরিত্রগুলিকে উপস্থাপিত করেছিলেন। বুদ্ধদেব এই নাটকে গ্রীক নাটকের ইলেকট্রার যে অনমণীয় মনোভাব ছিল সেই মনোভাবকে নিয়ে তিনি কলকাতার ইলেকট্রা চরিত্রে অঙ্কন করেছিলেন।

"তপস্বী ও তরঙ্গিণী" (১৯৬৬ খ্রীঃ) নাটকটি বুদ্ধদেবের স্মার্থক রচনা বলা যেতে পারে। নাটকটি পুরাণ কাহিনী আশ্রিত হলেও এই নাটকের কাহিনী অন্যভাবে রচিত। এই নাটকের পৌরাণিক চরিত্র তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী। বুদ্ধদেব আধুনিক মানসিকতায় চরিত্রগুলির মধ্যে সাংসারিক জীবনের দুঃখ দ্বন্দ্ববেদনা দেখিয়েছেন। তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবন ও বিবাহোত্তর প্রেমের কাহিনী তুলে ধরেছেন। তরঙ্গিণী ছিল পতিতা চরিত্র। তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গকে কামাতুর করে রাজধানীতে আনার শর্তে তরঙ্গিণী নিযুক্ত হয়েছিল। কেননা ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে বিবাহ হবে রাজকন্যা শান্তার। রূপ লাবণ্য, ছলনায় ঋষ্যশৃঙ্গের মনে মদন জ্বালা জ্বালিয়ে দিল তরঙ্গিণী, কিন্তু তার মনে জেগে উঠল বেদনা। তপস্বীকে প্রথমবার দেখেই শিহরিত হয়েছিল তরঙ্গিণী। এক জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে নারীমনস্ক করে তুলতে গিয়ে তরঙ্গিণী নিজের মধ্যে আবিস্কার করে এক চিরন্তন প্রেমিকা নারীকে। শান্তাকে পত্নিরূপে পেয়েও আত্মতুষ্টি তপস্বীকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। রাজ ঐশ্বর্য তাকে বাঁধতে পারে নি। শান্তার পূর্ব প্রণয়ীর হাতে তিনি দিয়ে গেলেন স্ত্রী-পুত্র। ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী মিলিত হতে পারেন নি। দুজনার দুটি পথ দুদিকে বেঁকে গেছে। সে পথ ছিল রিক্ত ও শূন্যতায় ভরা। এই নাটকের শেষের দিকে আমরা লক্ষ করি ঋষ্যশৃঙ্গের ঘরে তার পত্নী ফিরে পেয়েছে তার কুমারীত্ব। এই কুমারীত্ব সম্পর্কে বুদ্ধদেবের ব্যাখ্যা হল, বিবাহ বন্ধনে যদি প্রেম না থাকে, যদি দেহদান করেও হৃদয় উন্মুখ থাকে পূর্বপ্রণয়ীর জন্য, সে নারী কুমারী। সুতরাং ঋষ্যশৃঙ্গ বিবাহিত পুরুষ

মাত্র, কামনার পুরুষ নয়। বিবাহ নামক প্রচলিত অনুষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা এখানে দেখানো হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্য কর্মের বিস্তৃত অঙ্গনের মধ্যে পত্রিকা সম্পাদনা তাঁর সাহিত্য জীবনের এক বড় অংশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বুদ্ধদেব স্কুল জীবনেই যথাক্রমে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে "বিকাশ" ও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে "পতাকা" নামে হাতে লেখা দুটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক তিনি নিজেই ছিলেন। এছাড়া ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন-জুলাই মাসে তাঁর কৈশোরের বন্ধু অজিত দত্তের সঙ্গে "প্রগতি" সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকা সম্পর্কে বুদ্ধদেব লিখেছেন -

"আকার ফুলস্ক্যাপ অষ্টমাংশ, হলদে মলাটে উর্দ্ধমুখ একটি নারী মুণ্ড আঁকা, প্রথম রচনা অচিন্ত্যের একটি অষ্টাদশপদী কবিতাঃ "আমার পরান মুখর হয়েছে সিন্ধুর কলরোলে"। আর ছিলো পিরানদেল্লো বিষয়ে প্রবন্ধ, সম্ভবত জীবনানন্দের একটি কবিতা তখনকার মাসিক পত্রের পক্ষে অপরিহার্য ধারাবাহিক উপন্যাসটি আমিই কপালে ঠুকে শুরু করেছিলাম। প্রথম বছরের বারোটি সংখ্যা নিয়মিত বেরিয়েছিল, মনে পড়ে, বেশ একটু চাঞ্চল্যও তুলেছিল"। - ২০

এই সময় বুদ্ধদেবের দাদামশায়ের মৃত্যু হয়। সংসার চালানোর দায় তাঁর উপর পড়েছিল। সহায় সম্বলহীন বুদ্ধদেব ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার কৃতকার্যের জন্য ২০টাকা বৃত্তি পেতেন। এই টাকা পত্রিকার তহবিলে জমা দিয়েছিলেন। এতে পত্রিকা চালানো সম্ভব না হওয়ায় বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় পরিজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি দিদিমার কিছু গহনা বিক্রি করেছিলেন এই "প্রগতি" পত্রিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। এই পত্রিকার সম্পাদনার ভালোবাসার কথা জানিয়ে তিনি বন্ধু অচিন্ত্যকুমারকে জানিয়েছিলেন -

"প্রগতি উঠে গেলে আমার জীবনে যে Vacuam আসবে তা, আর কিছু দিয়েই পূর্ণ করার মত নয় সে হিসেবেই সবচেয়ে খারাপ লাগছে। প্রগতিকে টিকিয়ে রাখা সত্যই বোধ হয় যাবে না। তবু একেবারে আশা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না, কুসংস্কার-গ্রস্ত Miracle-এ বিশ্বাস করবার দিকে ঝুকে পড়ছি"। - ২১

"প্রগতি" শেষ পর্যন্ত ১৯২৯ সালে বন্ধ হয়ে গেল, তবু আধুনিক কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব "প্রগতি"র পাতায় যে বিদ্রোহকে প্রকাশ করেছিলেন তা চিরস্মরণীয়, এরপর ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় "কবিতা" পত্রিকা প্রকাশিত হয়। "কবিতা" পত্রিকা প্রকাশ করে বাংলা কবিতাকে একটি স্বতন্ত্র সিংহাসনে অধিষ্টিত করলেন, যা বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে একটি অভিনব সংযোজন বলা যেতে পারে।

এই "প্রগতি" ছিল প্রথমে হাতে লেখা পত্রিকা। এই পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর ঢাকার সাহিত্য মহলে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। এই পত্রিকা ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধ হয়ে গেল এবং তার তিন মাস পর "কল্লোল" পত্রিকাও বন্ধ হয়ে গেল। সেসময় বুদ্ধদেব ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করার পর সমবয়স্ক ক-জন বন্ধু মিলে "ক্ষণিকা" নামে একটা হাতে লেখা পত্রিকার মাধ্যমে বুদ্ধদেব নিয়মিত কাব্য চর্চায় মন দিয়েছিলেন। এই পত্রিকাটির প্রধান লিপিকর বুদ্ধদেব নিজেই ছিলেন। সে সময় ঢাকার অন্য অঞ্চলে আরেকটি হাতে লেখা পত্রিকা সুধীশ ঘটক এর (মণীশ ঘটকের ছোট ভাই) সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেটির নাম "ভগ্নরথ"(১৯২৭ খ্রীঃ)। এছাড়া বুদ্ধদেব বসু ও হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে এক বছরের ত্রৈমাসিক "চতুরঙ্গ" ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশ করেন। বুদ্ধদেব বসু এরপর "পরিচয়" পত্রিকা ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রকাশ করেন।

এইভাবে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদনার মধ্য দিয়ে বুদ্ধদেব বাংলার সাহিত্য পত্রিকার ইতিহাসে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। একের পর এক বুদ্ধদেব বাংলা সাময়িক পত্রিকার জগতে দক্ষতার সঙ্গে পত্রিকার সম্পাদনা করার জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব শুধু ছাপার হরফে ভালো কবিতা প্রকাশই করেন নি, ভালো পাঠক তৈরী করার ব্যাপারে সজাগ ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন

অনুকূল অনুসঙ্গে সাহিত্যের পাঠক তৈরী হতে পারে, কিন্তু কবি তৈরী করা যায় না। পত্রিকার সম্পাদনার জগতে তিনি ছিলেন শিক্ষকের মত। সম্পাদক হিসাবে তার একটি গুণ ছিল, সেটি হলো কোন তরুণ লেখকদের লেখা পছন্দ না হলে তিনি অনেকটা সংশোধন করে প্রকাশ করেছিলেন কিম্বা নিজের মতামত জানিয়ে কবির মতামত নিয়ে পণ্ডুলিপি সংশোধন করে দিতেন। এইভাবে বহু কবি ও লেখক তাঁর পত্রিকা জগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন।

শিশু সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর চিন্তার একটা প্রতিফলন আমরা লক্ষ করি। আমাদের সংসারে শিশু আনন্দের প্রতীক। শিশু মনের এই আনন্দকে কবি সাহিত্যিকরা তাদের গল্প, ছড়া ও কবিতার মধ্যে দিয়ে ধরবার চেষ্টা করেন। তাই শিশু সাহিত্য হলো সাহিত্যিকদের ফেলে আসা শৈশবকালের প্রতিলিপি। স্মৃতিচারণের মাধ্যমে অতীতের ঘটনাকে সাহিত্যে রূপান্তর করে মাত্র, আর পিছনে তাকাতে গিয়ে দুঃখ ও আনন্দের মুহূর্তগুলি আমাদের চেতনাকে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দেয়। বুদ্ধদেব বসুর জীবনেও ঐ স্মৃতিগুলি আরো বেশী প্রখর, কারণ প্রথম থেকেই তিনি পিতা মাতাকে হারিয়েছিলেন। অবশ্য যে সময় তিনি শিশু সাহিত্য রচনা করেছিলেন সেই সময় বিখ্যাত শিশু লেখকদের সমকক্ষ না হলেও তাঁর শিশু সাহিত্যগুলি সেকালের প্রচলিত লেখার ভঙ্গি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। অনেক ক্ষেত্রেই যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার প্রভৃতি বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিকদের ছায়াপাত লক্ষ করা যায়। তিনি জানিয়েছেন - "আমরা ছোট ছিলাম বাংলার শিশু সাহিত্যের সোনালী যুগে"। তাই বুদ্ধদেবের শিশু সাহিত্যগুলি পাশ্চাত্যের ল্যুইস ক্যারল, এডওয়ার্ড লিয়র ও হ্যান্স এন্ডারসনের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। শিশু সাহিত্যগুলির প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মনোভাব খুব একটা বড়দের থেকে ভিন্ন নয়। একই চিন্তা, কখনও একই মেজাজ তাঁর ছোট গল্পে লক্ষ করা যায়। তবে তাঁর লেখায় হাসি ঠাট্টা খুব বেশি

থাকতো। অবশ্য শেষের দিকে সেই ঝোঁক কেটে গিয়ে কিছুটা যেন গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধদেবের শিশু সাহিত্য লেখায় দুটি ধারা ছিল, প্রথম ধারায় যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দ্বিতীয় ধারায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, ক্যারল এন্ডারসনের লেখা শিশু সাহিত্য। বুদ্ধদেবের দরদী মনের সহানুভূতি দুই ধারার শিশু সাহিত্যে লক্ষ করা যায়। বুদ্ধদেব বসুর শিশু সাহিত্যগুলো হলো - "প্রথম দুঃখ", "একটা পরীর গল্প", "রুমির পত্র বাবাকে", "ঘুমের আগে গল্প", "রামধনু", "যা চাও-পাই", "ড্যানির ভাবনা", "বিশেষ কিছু নয়", "ভূগোল ভঙ্গিমা", "স্বাস্থ্য সিদ্ধি", "পদার্থ পরীক্ষা", "বিশ্ববিক্ষা", "কান্তিকুমারের নার্ভাস ব্রেকডাউন", "গায়ে কাঁটা-পেটে খিল" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধদেব বসুর "রামধনু" কবিতায় শিশুর মনের আনন্দকে তিনি অসাধারণ মহিমায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতায় সহজ সরলতার মধ্যেও একটা গাম্ভীর্য দেখা যায়। এখানে শিশুর কল্পনা আকাশ ছুয়ে গেছে -

"বাবা-মা এসোগো, রামাঝি, রামজী,
এসো ছোড় দা, ন'দি -
আকাশ জোড়া এ রামধনু চাও
দেখতে যদি।" - ২২

বুদ্ধদেব বসু শিশু কাহিনীতে সবসময়েই গভীরভাবে শিশুর মনে প্রবেশ করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর কবিতাগুলি আমাদের শিশু মনের প্রতি একান্ত বিশ্বাসী হতে সাহায্য করে। শিশু মনের বিকাশে তাঁর লেখা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। মাঝে মাঝে তাঁর লেখায় গভীর ভাব লক্ষ করা যায়। সহজ সরলতা তাঁর লেখায় নেই বললেই চলে।

বুদ্ধদেব বসু কাব্য ও প্রবন্ধের পাশাপাশি কথাসাহিত্যের ধারাটিকেও নূতন পথে সঞ্চারিত করেছিলেন। তাঁর কথাসাহিত্যর মধ্যে ছোটগল্প রচনায় চিন্তা ও শিল্পাদর্শের নূতনত্বের আভাস পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, সেকালের প্রতিষ্ঠিত

ছোটগল্পকারদের মতো তাঁর শিল্পী ব্যক্তিত্ব না থাকলেও তিনি কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের কক্ষপথে বিচরণ করে জীবনের এক বিশেষ তাৎপর্য ছোটগল্পে তুলে ধরেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু ষোল-সতেরো বছর বয়স থেকেই গল্প লিখতে শুরু করেন। ত্রিশ-চল্লিশের দশকেই তাঁর গল্প রচনার উর্বরতর সময়। অবশ্য চল্লিশ দশকের শেষের দিকে তাঁর গল্প রচনার স্রোত কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে, একথা তিনি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি গল্প সংকলনের ভূমিকায় জানিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসুর গল্পগ্রন্থ ও সংকলন গ্রন্থের সংখ্যা ৩০টি। এই ত্রিশটির মধ্যে শুধু "জ্বর" ও "মেজাজ" (১৯২৮ খ্রীঃ) গল্প দুটি সাধুভাষায় লিখেছিলেন। বাকি সমস্ত গল্পই তিনি চলিত গদ্যে রচনা করেন। তাঁর অধিকাংশ গল্পগুলি "কল্লোল", "প্রগতি", "পরিচয়" ও "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বুদ্ধদেব বসুর গল্পগ্রন্থগুলি হলো - রজনী হ'লো উতলা (১৯২৬ খ্রীঃ), অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্প (১৯৩০ খ্রীঃ), রেখাচিত্র (১৯৩১ খ্রীঃ), এরা আর ওরা (১৯৩৪ খ্রীঃ), রঙ্গিন কাচ (১৯৩৩ খ্রীঃ), অদৃশ্য শত্রু (১৯৩৩ খ্রীঃ), ঘুমপাড়ানি গান (১৯৩৩ খ্রীঃ), নতুন নেশা (১৯৩৩ খ্রীঃ), সংক্রান্তি (১৯৩৩ খ্রীঃ), প্রেমের বিচিত্র গতি (১৯৩২খ্রীঃ), মিসেস গুপ্ত (১৯৩৪ খ্রীঃ), প্রেমপত্র ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৪ খ্রীঃ), শ্বেত পত্র (১৯৩৪ খ্রীঃ), শনিবারের বিকেল (১৯৩৬ খ্রীঃ), ফেরিওয়ালা (১৯৪১ খ্রীঃ),খাতার শেষ পাতা (১৯৪৩ খ্রীঃ), একটি কি দুটি পাখি (১৯৫৪ খ্রীঃ), একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু (১৯৬০ খ্রীঃ), হৃদয়ের জাগরণ (১৯৬১ খ্রীঃ), ভাসে, আমার ভেলা (১৯৬৩ খ্রীঃ) এছাড়া চেকভের অনুদিত একটি গল্প "কাল একটি পরীক্ষা"।

বুদ্ধদেব বসুর গল্পের বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে দেখা যায়, অর্ধেকেরও বেশি গল্পের বিষয়বস্তু ছিল প্রেম। বাকি গল্পগুলি বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে লেখা। তাঁর ছোটগল্পে বাস্তব সাংসারিক জীবনের বিবরণ নেই, নেই মানুষের বেঁচে থাকার তীব্র লড়াই। তাঁর গল্পের মূল উপাদানই ভালোবাসা। এই ভালোবাসা কখনও জীবন ও

প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে দেখা যায়, আবার কখনও ভালোবাসার অপমান ও প্রত্যাখ্যানের দিকগুলি তাঁর ছোটগল্পে ফুটে উঠেছে। তাঁর ছোটগল্পের পটভূমিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসেছে নগর জীবন। বিশেষ করে ঢাকা ও কলকাতা শহর। ফলে ত্রিশ দশকের নাগরিক জীবনের নর-নারীর প্রেম তাঁর ছোট গল্পে প্রাধান্য পেয়েছিল। বুদ্ধদেবের ব্যক্তি জীবনের কিছু পরিচয় তাঁর ছোট গল্পে ফুটে উঠতে দেখি। বুদ্ধদেবের ছোটগল্পে চরিত্রগুলি উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি পরিবার থেকে এসেছে। তিনি কখনও গল্পের বৈচিত্র্য ও স্বাদ আনতে অজানা ও অপরিচিত দেশ ও সমাজের চিত্রকে তুলে ধরেন নি। ঢাকা ও কলকাতায় বসবাসকারী মানুষের চলাফেরা ও আচার-আচরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি গল্পে তুলে ধরেছেন। তাঁর চরিত্রকে দেখলে মনে হয় জীবন্ত রক্ত-মাংসের মানুষ। চরিত্রের সজীবতা গল্পে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। গল্পের প্রকৃতি বলতে ঢাকার পুরানা-পল্টন ও ময়মনসিং জেলার কথা বার বার এসেছে। এছাড়া কলকাতা পটভূমি কেন্দ্রিক গল্পে জীবনের গতিময়তার ও ব্যস্ততার ছবিটি দেখা যায়। এই ছবিতে জীবনের যোগ ততটা নেই। শুধু প্রেমের গল্পই নয়, অন্য বিষয়ের গল্পতেও বুদ্ধদেবের শিল্প কুশলতা লক্ষ করা যায়। স্বামীর সঙ্কীর্ণ নিষ্ঠুরতার পরিচয়, "জ্বর" ও "ফেরিওয়ালা" গল্পে দেখতে পাই। আবার "মা-ভাই-বোন", "দুই মা", "প্রথমা" গল্পে সংসার জীবনের নীচতা ও হৃদয়হীনতার জঘন্য দিকটি বুদ্ধদেব বসু আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। "মেজাজ ও হতাশা" গল্পে পুরুষের বিভিন্ন ইতর আচরণের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি "বোন" ও "অসমাপ্ত" গল্পে নারীর ইতরতার পরিচয়ও পাই। "রাধারাণীর নিজের বাড়ি" ছোট গল্পে ব্যক্তিগত জীবনের উচ্ছ্বাস, উচ্চাশা, নারীর জীবন কিভাবে পুরুষের জীবনকে তিলে-তিলে ক্ষয় করে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে "চোর চোর" গল্পে বারবণিতার জীবনের চিত্ররূপ ফুটে উঠেছে। এছাড়া বুদ্ধদেব বসু "প্রশ্ন" গল্পে দেখালেন মধ্যবিত্ত পরিবারের ধ্বংসের ছবি।

বুদ্ধদেবের প্রেমের গল্পে নর-নারীর জীবনের দেহকামনা ও ভোগের বিভিন্ন উচ্ছ্বাস দেখা যায়। "অভিনয়, অভিনয় নয় ও অন্যান্য গল্পগ্রন্থ" এর "প্রথম ও শেষ" গল্পে দেখা যায় লীনার প্রেমের উন্মাদনা। তার প্রেম অভিজাত এক পুরুষের সঙ্গে। লীনা দরিদ্র ঘরের মেয়ে। সম্পর্কের বাতাবরণে লীনা এক প্রেমিক পুরুষের সঙ্গে দেহ দান করে। কিছুদিন পরে লীনার প্রেমিকের মৃত্যু ঘটে। লেখক দেখালেন অন্য পাঁচজন মেয়ের মতই লীনা অন্য পুরুষকে বিয়ে করেছে। কিন্তু বিগত প্রেমের কোন ব্যথা বেদনা তাকে পীড়িত করে নি। বুদ্ধদেবের অধিকাংশ গল্পেই দাম্পত্য জীবনের প্রেম ও বিবাহোত্তর প্রেমের চূড়ান্ত পরিণতি দেখা যায়। তাঁর "ফেরিওয়ালা" গল্পগ্রন্থের গল্পগুলির মধ্যে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী মনের দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের রূপটি ফুটে উঠেছে। তাঁর গল্পের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নর-নারীরা দেহ বিনিময় করে না। যেখানে যা প্রয়োজন সেই যৌন কামনা চরিতার্থ করতেই চরিত্রগুলিকে দেখা যায়। বুদ্ধদেবের শেষের দিকের বিখ্যাত ছোটগল্প "ভাসে আমার ভেলা" শেষতম সংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অন্তর্গত গল্পগুলির বিষয়বস্তু ও রচনারীতির নূতনত্ব লক্ষ করা যায়। বুদ্ধদেবের শেষের দিকের গল্পে প্রেমের মিলন না দেখিয়ে বিচ্ছেদ ও হতাশার দিকগুলি দেখতে পাই। এই পর্বের গল্পগুলিতে ভালোবাসার নূতন মূল্যায়ন বুদ্ধদেব বসু করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন -

"বুদ্ধদেবের গল্পে ভালোবাসা জীবনের একটি মাত্র অধ্যায় নয়, পরিপূর্ণ অনুভূতি, সমগ্র সত্তার বিলুপ্তকারী অভিজ্ঞতা। বাংলা ছোটগল্পের রাজ্যে এই অধুনা বিরল দর্শন বুদ্ধদেব বসুর প্রেমের গল্প পাঠকের কাছে এক সুখকর অভিজ্ঞতা।" - ২৩

বুদ্ধদেবের ছোট গল্পে বিদেশী লেখকদের লেখার আঙ্গিক লক্ষ করা যায়। লরেন্স, চেকভ, পিরানদেল্লা, জন আর্সকাইন, স্যার গালাহোড প্রভৃতি বিদেশী লেখকদের গল্পের রচনারীতি ও ভাবাদর্শ তিনি অনুসরণ করেছিলেন। যেমন, জন

আর্সটাইন ও স্যার গ্যালাহোড গল্পের অনুসরণে বুদ্ধদেব বসু "পুরাণের পুনর্জন্ম" এবং লরেন্সের "ওল্ডার অফ ক্রিসেন থিমাম" গল্পের অনুকরণে "তুলসী গন্ধ" গল্পটি লিখেছিলেন। বুদ্ধদেবের ছোটগল্পে গল্পরীতি লক্ষ করলে দেখা যায় তিনি তৃতীয় পুরুষের জবানীতেই বেশিরভাগ গল্প রচনা করেছিলেন। আবার আত্মকথন রীতি ও লেখকের জবানীতেও গল্প রচনা করেছিলেন। বুদ্ধদেবের অধিকাংশ গল্পে দেখা যায়। নূতন বড়লোক হওয়া মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারের যুবক যুবতীদের গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্রের ভূমিকায়। চরিত্রগুলি অধিকাংশই আকাশ কুসুম কল্পনা করে। মানবিক মূল্যবোধ ও মর্যাদাবোধ চরিত্রগুলির মধ্যে খুবই কম দেখা যায়।

উল্লেখপঞ্জী

১) আমার ছেলেবেলা/বুদ্ধদেব বসু/ প্রথম প্রকাশ মার্চ- ১৯৭৩, প্রকাশক- সুপ্রিয় সরকার, মুদ্রক- পরাণচন্দ্র রায়, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-১২/পৃষ্ঠা- ১০

২) ঐ/ পৃষ্ঠা- ১১

৩) ঐ/ পৃষ্ঠা- ১৪

৪) ঐ / পৃষ্ঠা- ৭২

৫) ঐ/ পৃষ্ঠা- ৩২

৬) "বুদ্ধদেব বসু ঃ ইস্কুলে আর কলেজে" / ভবতোষ দত্ত। ৩০শে নভেম্বর ১৯৮৭, কবিতা ভবন বার্ষিকী সংখ্যা / পৃষ্ঠা-৩১

৭) কল্লোল যুগ/ অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, শমিত সরকার, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩, ১ম সংস্করণ ১৯৭৬ খ্রীঃ / পৃষ্ঠা- ১২২

৮) কল্লোল যুগ/ অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, শমিত সরকার, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩, ১ম সংস্করণ ১৯৭৬ খ্রীঃ / পৃষ্ঠা- ১২৩

৯) কল্লোল যুগ/অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত/ শমিত সরকার, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩, ১মসংস্করণ,১৯৭৬/ পৃষ্ঠা- ১২৬

১০) কল্লোল যুগ/অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত/ শমিত সরকার, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩, ১ম সংস্করণ ১৯৭৬/ পৃষ্ঠা- ১২৭

১১) আমার যৌবন, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড/ গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ / কোলকাতা - ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭/ পৃষ্ঠা- ৪২৮

১২) জীবনের জলছবি / প্রতিভা বসু, প্রথম প্রকাশ- বৈশাখ, ১৪০০ থেকে চতুর্থ মুদ্রণ- ফাল্গুন ১৪০৫ পর্যন্ত, পঞ্চম মুদ্রণ- শ্রাবণ- ১৪০৯, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা-৯/ পৃষ্ঠা- ৯৭

১৩) কনিষ্ঠ কন্যাকে চিঠি ৭/১২/১৯৬২, "দেশ" পত্রিকায় বুদ্ধদেবের আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৮৮-১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত চিঠি।

১৪) বুদ্ধদেব বসুর জীবন / সমীর সেনগুপ্ত, বিকল্প প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ৩০শে নভেম্বর ১৯৯৮, কলকাতা-৪/ পৃষ্ঠা- ২০২

১৫) যুগান্তর/১০ই জুলাই, ১৯৬১

১৬) Budhyadev Bose, Tagore : Portrait of a Poet, Calcutta, Papirus, 1962 দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।

১৭) "দেশ"। ২৩ চৈত্র ১৩৮০ বঙ্গাব্দ।

১৮) উৎসঃ বুদ্ধদেব বসু, ভুঁইয়া ইকবাল বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, / পৃষ্ঠা- ১২১

১৯) বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, (প্রথম খণ্ড) বন্দীর বন্দনা/ দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ৯ ই মে ১৯৯১, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ কলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ১৯

২০) আমার যৌবন, বুদ্ধদেব বসু, বুদ্ধদেব রচনাসংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৪/ পৃষ্ঠা- ৪০০

২১) বুদ্ধদেব বসুর ৭ নং চিঠিঃ অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তকে, বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭, বিশেষ সংস্করণ ১৬ই আগষ্ট ১৯৮২, গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ / পৃষ্ঠা- ৫৬৪

২২) বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ, (প্রথম খণ্ড)/ দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ৯ ই মে ১৯৯১/ গ্রন্থালয় প্রাঃ লিঃ কলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ২১৬

২৩) কালের পুত্তলিকা- অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়/প্রথম প্রকাশ ১৯৯১, দেঁজ পাব্লিশিং, কোলকাতা-৭৩ / পৃষ্ঠা- ২০৭